নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

মার্চ ২০১৭ ■ ফাল্গুন - চৈত্র ১৪২৩

সৌজন্য সংখ্যা

সম্পাদকীয়

কী আনন্দ! শিশুদের জন্য বিশেষ দিবস জাতীয় শিশু দিবস এসে গেছে। ১৭ মার্চ দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, এই মাসের ১৭ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর তাঁর জন্মদিনটিকেই বেছে নেওয়া হয়েছে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে। কারণ তিনি যে শিশুদেরকে খুব ভালোবাসতেন।

বঙ্গবন্ধু কবি, তাঁর কবিতার নাম স্বাধীন বাংলাদেশ। তিনি স্বাধীনতার কবি। তাঁর জন্ম না হলে আজকের শিশুরা স্বাধীন বাংলাদেশে জন্মগ্রহণের সৌভাগ্য পেত না। তিনি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তারিখে তাঁর সেই ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম', সেই ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ দেশের মানুষ যুদ্ধ করে স্বাধীনতাকে অর্জন করতে পেরেছিল। তাই তাঁর জন্মদিন শিশুদের জন্য খুব আনন্দের একটি দিন।

মনে আছে তো, ২৫ মার্চ ১৯৭১-এর কথা? সেই কালরাতে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ানক গণহত্যা চালিয়েছিল পাকিস্তানি শাসকেরা। আর তাই ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস হিসেবে জাতীয়ভাবে পালিত হচ্ছে। এই প্রথম দিবসটি এভাবে পালন করার ঘোষণা দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বকে গণহত্যার মতো জঘন্য অপরাধের বিষয়ে সতর্ক করে দিল।

মনে আছে কি, ২৬ মার্চ ১৯৭১-এর কথা? ২৫ মার্চের কাল রাতে বাঙালিদের উপর নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালানো পাকিস্তানি শাসকেরা বন্দি করল বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে। বন্দি হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর অবশেষে ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয় চূড়ান্ত বিজয়। আমরা পেয়ে যাই লাল-সবুজের বাংলাদেশ।

আর তাই, ২৬ মার্চ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস হিসেবে পালন করি আমরা। এই দিনটি অনেক আনন্দের, আবার অনেক দুঃখেরও। পরম শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে অংশগ্রহণকারী দেশের জনগণ এবং ত্রিশ লাখ শহিদের পবিত্র আত্মাকে।

প্রধান সম্পাদক
মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ

সিনিয়র সম্পাদক
মোঃ এনামুল কবীর

সম্পাদক
নাসরীন জাহান লিপি

শিল্প নির্দেশক
সঞ্জীব কুমার সরকার

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
ফিরোজ চন্দ্র বর্ম্মন

সম্পাদকীয় সহযোগী
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফফাত আঁখি

সহযোগী শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

অলংকরণ
সুবর্ণা শীল
নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মুহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৪২, ৯৩৩১১৮৫
E-mail : editornabarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : ২০.০০ টাকা

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস, ১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সূচি

নিবন্ধ

০৫ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ / ইমরুল ইউসুফ
০৮ ডাকটিকিটে বঙ্গবন্ধু / মো. ইফতেখার হাসানাত
৪১ বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোটো ব্যান্ড / আ ন ম আমিনুর রহমান

স্মৃতিময় একাত্তর

৩০ ভয়ংকর রাত / হাফিজ উদ্দীন আহমদ
৩২ মুক্তিযোদ্ধা মুকুল ও নবিতা যেভাবে জীবন দিলেন / আখতার জাহান মল্লিক
৩৮ যুদ্ধে গেলাম কেমন করে / মিলি হক

বড়োদের গল্প

৩৪ পাগলু / কাজী কেয়া
৪০ মা পাখিটা / হাসি ইকবাল
৪৩ নীলিমের ফিরে আসা / ড. শিল্পী ভদ্র

ছোটোদের গল্প

৪৭ শপথ / ফাতেমা জান্নাত

ছোটোদের কবিতা

২৬ ওয়াসেক ফয়সাল / সৈয়দ মুয়িদুল ইসলাম আর্নিব
৪৯ সা'দ সাইফ / মো. রিদওয়ানুল ইসলাম রিফাত
আনিশা রহমান (কথা) / আদনান শাহরিয়ার

সাফল্য

৫০ মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ উন্মুক্ত করল পাঁচ হাজার ছবি / মেজবাউল হক
৫১ প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্রতিবেদন / সুলতানা বেগম
৫৩ শিক্ষা সংবাদ / শাহনা আফরোজ
৫৪ নারীর ক্ষমতায়ন: কন্যাশিশুর সাফল্য / জান্নাতে রোজী
৫৫ স্বাস্থ্য: শিশু বিকাশ / মো. জামাল উদ্দিন
৫৭ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ / তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৫৮ বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, ২০১৬ / প্রসেনজিৎ কুমার দে
৬০ দশদিক / সাদিয়া ইফফাত আঁখি

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা

১২ সৈয়দ শফিউল আজম / আলম তালুকদার
১৩ আমিরুল হক / মো. মনিরুজ্জামান (মনির)

বড়োদের কবিতা

০৩ দেলওয়ার বিন রশিদ
২৪ জাহানারা জানি
২৭ সালেম সুলেরী / মাহবুব লাভলু / নুরুল ইসলাম বাবুল
২৮ দেলোয়ার হোসেন / ফখরুল ইসলাম রচি / ফারুক হাসান
২৯ নাসিরুদ্দীন তুসী / রওশন মতিন / সাঈদ সাহেদুল ইসলাম
৩৩ তোফায়েল তফাজ্জল

ছোটোদের নিবন্ধ

০৪ এক মহান নেতা / আব্দুল্লাহ মারজুক
২৫ জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও মুক্তিযুদ্ধ / রিফাত নাহার দিশা

ছোটোদের স্মৃতিময় একাত্তর

১৫ আমার চোখে মুক্তিযুদ্ধ / দিতু চৌধুরী
১৬ মুক্তিযুদ্ধের দুটো সত্য ঘটনা / তাহিয়া ফেরদৌসি অনন্যা
১৭ নানার মুখে যুদ্ধের কথা / অভ্র ফারিহা
১৯ সে এক ভয়ানক রাত / রুম্মান হাফিজ
২২ স্মৃতিতে একাত্তর / তানজিদ নূর রাফি

ছোটোদের আঁকা

০৪, ১২ ফারজানা ইয়াছমিন তানিয়া / সৈয়দ জারসিস ইয়াসা
১৩ বিস্তি প্রতিকা / তাসনোভা আলম (নিশান)
২০, ২৩ তাসনিম ফেরদৌস (শান্ত) / অর্পিতা রায় বর্মণ
২৫, ৩০ ওয়াফা মুনসাদ / মো. দিলদিল হোসেন
৩২, ৩৪ শিফা বিনতে শাহীন / আজমেরী সুলতানা রিমু
৩৬, ৩৮ সাজনিন আসমা (ইস্পা) / বিম্বি হিমিকা
৩৯, ৪৮ আরিবা রাইয়াত জারা / হাসান মুশফিক শাবাব
৬২ নাজিফা তাবাসসুম (কথা) / নরনিল আহমেদ
৬৩ ওয়াসিফা ওসমান / ইয়ামীম সাদমান
৬৪ আহমেদ উল্লাহ / হাসিবুল হাসান
৬৫ মাইশা মেহজাবিন / ইফতি

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২৬ মার্চ ২০১৭ উপলক্ষে নবারুণ চেয়েছিল যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি, সেই সব খুদে বন্ধুর চোখ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে দেখতে। আর তাই বন্ধুদের অনুরোধ করা হয়েছিল, পরিবারের বা এলাকার বড়োদের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের সত্য ঘটনা জেনে লিখে পাঠাতে। বড়োদের কাছে শুনে তোমাদের 'চোখে' দেখা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা পড় পৃষ্ঠা ১৫ - ২২।

স্বাধীনতার কবি

দেলওয়ার বিন রশিদ

আমার এ দেশ বাংলাদেশ
একটা সবুজ গ্রাম
বাংলাদেশের সবুজ জুড়ে
শেখ মুজিবের নাম।

মেঠো পথে সবুজ ঝাড়ে
বুনো ফুলের মেলা
বইচি বনে উতল হাওয়া
নিত্য করে খেলা।

বাংলাদেশের সবুজ শোভায়
শেখ মুজিবের ছবি
মুজিব আমার জাতির পিতা
স্বাধীনতার কবি।

মুজিব আমার কাব্য গাথা
মুজিব আছে হৃদয়ে
মুজিব আছে প্রিয় পতাকায়
স্বাধীনতা বিজয়ে।

শুভ জন্মদিন, স্বাধীনতার কবি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর
৯৮তম জন্মদিবস
ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে

শুভেচ্ছা

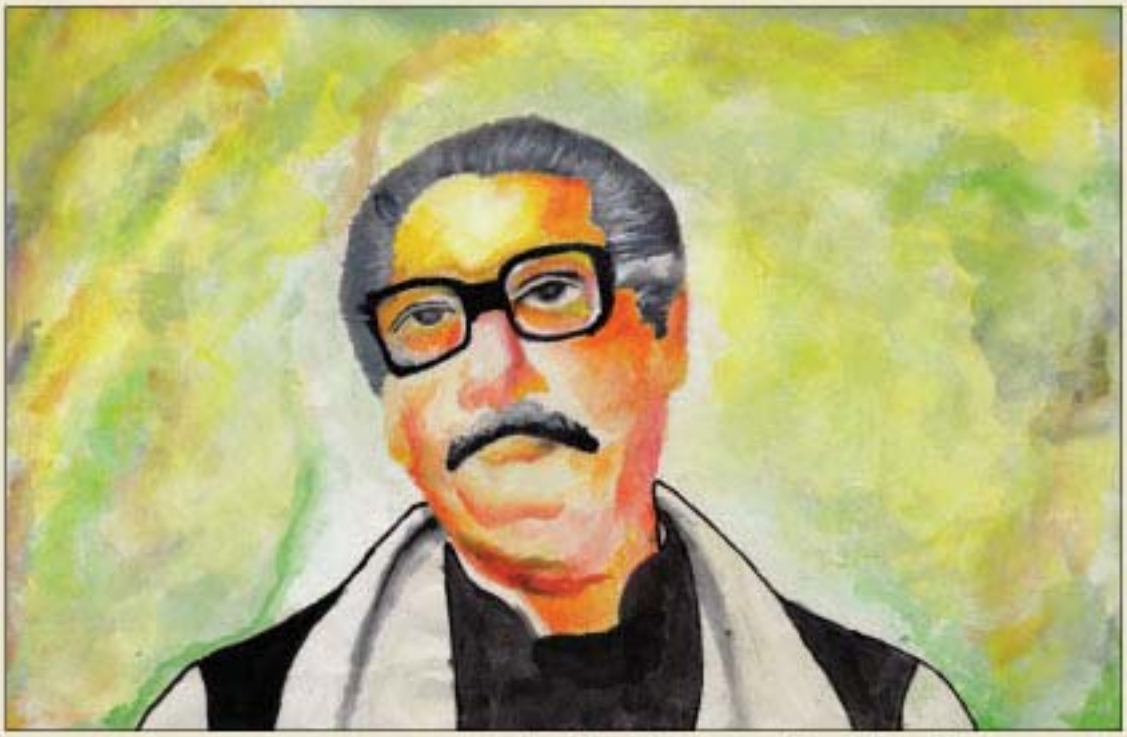

ফারজানা ইয়াছমিন ডালিয়া, একাদশ শ্রেণি, মতিঝিল আইডিয়াল কলেজ, ঢাকা

এক মহান নেতা

আব্দুল্লাহ মারজুক

ছোটোবেলায় আমরা নানুর বাসার পাশাপাশি একটি বাসায় থাকতাম। আমাদের বাসা ছিল পঞ্চম তলায়। আমি যখন দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ি তখন ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের স্কুল ছুটি। আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে পাশেই নানুর বাসায় যাওয়ার পথে শুনতে পেলাম মহল্লার মাইকে বাজছে 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

নানুকে সাথে সাথে জিজ্ঞাসা করলাম নানু এটি কার কণ্ঠস্বর? উনি কী বলছেন। নানু বলল, ভাই— জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ভাষণ। ওনার জন্যই তো আমরা স্বাধীন হয়েছি। কিন্তু সেদিন কিছুই বুঝিনি। তবে এখন আমি বিষয়টি বুঝতে শিখেছি। এ ভাষণে সাড়া দিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতি সেদিন ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বজ্রকণ্ঠে ভাষণ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ করেছেন। বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য সংগ্রাম করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন ভূখণ্ড এবং একটি লাল-সবুজ পতাকা।

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। *বঙ্গবন্ধুর সহজপাঠ* বইটি পড়ে আমি জানলাম ছোটোবেলা থেকেই তিনি মানুষকে ভালোবাসতেন। কারো বই না থাকলে নিজের বই খাতা দিয়ে দেওয়া, ছাতা না থাকলে ছাতা দেওয়া এবং গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করা ছিল তাঁর নিত্যদিনের কাজ। এতে তাঁর বাবা-মা এতটুকুও বিরক্ত হতেন না। শুধু গরিব-দুঃখী মানুষই নয়, তিনি এদেশের সকল মানুষের কথা ভেবেছেন। পাকিস্তানি শাসকদের হুমকি ও জেল জুলুমকে ভয় না পেয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন। কিশোর বয়স থেকেই তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেন এবং সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কথা বলেছেন।

বিশ্ব ইতিহাসে তাঁর মতো নেতার উদাহরণ নেই বললেই চলে। তিনি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিয়ে এদেশের সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা। প্রকৃত দেশপ্রেম ও সচেতনতা নিয়ে আমরা এ মহান নেতাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করব।

নবম শ্রেণি, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা

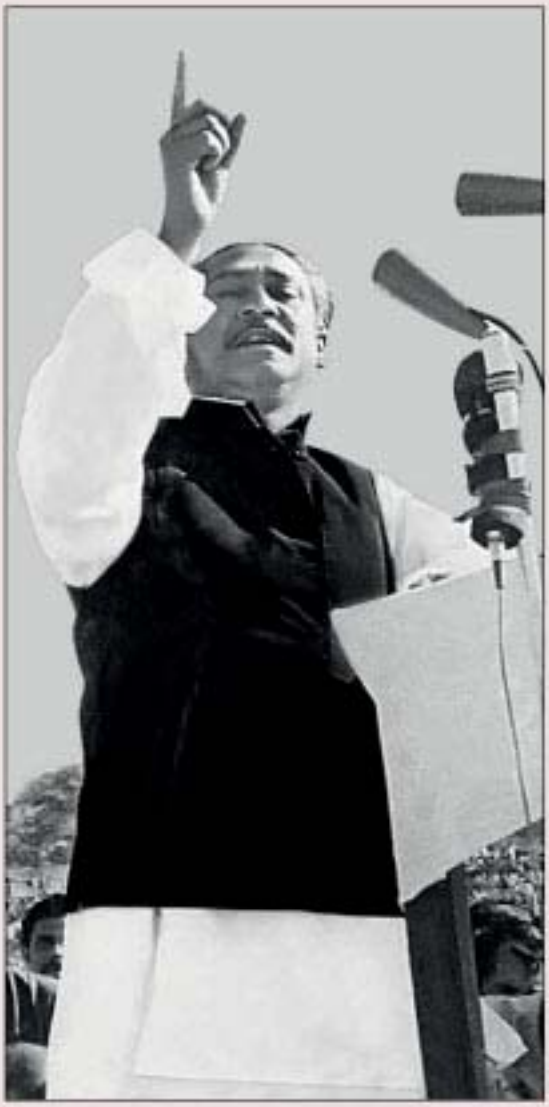

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ

ইমরুল ইউসুফ

মার্চ এলেই আমি ফিরে যাই ১৯৭১ সালের মার্চে। আমি কি ছিলাম সেই মার্চে? কিংবা দেখেছিলাম মার্চের শুরুতেই অহিংস অসহযোগ আন্দোলন?

মার্চের ২ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম পতাকা উত্তোলন। ৩ মার্চ পল্টনে ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগের সভা। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাক। ২৫ মার্চ পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর গণহত্যা। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা।

না, ঐতিহাসিক এসব ঘটনার কোনো কিছুই আমি দেখিনি। কোনো মিছিলে যাইনি। জনসভায় যাইনি। কারণ আমার জন্ম হয়েছে ৭১-এর অনেক পরে। কিন্তু আমি মার্চ এলেই ফিরে যাই বাংলাদেশের স্বপ্নের সেই মাসে।

আমার কাছে মাসটি আসলেই স্বপ্নের মাস। কল্পনা ভেসে গিয়ে সাত কোটি বাঙালির স্বপ্ন ছুঁয়ে আসার মাস। হালকা শীতে ভাবনায় ওম দিয়ে সেই মাসের উষ্ণতা অনুভব করার মাস। তাই মার্চ এলেই আমি স্বপ্নাতুর হয়ে যাই। স্বপ্ন দেখি আমি আছি সেই মিছিলে। সেই যুদ্ধে। বঙ্গবন্ধুর সেই জনসভায়। সকলের সঙ্গে আমিও হাঁটছি। স্লোগানে স্লোগানে উত্তপ্ত করে তুলছি সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। আমি বসে আছি মঞ্চের ঠিক সামনে। দেখছি বঙ্গবন্ধুকে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছি তাঁর ভাষণ।

কি পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু ইতিহাস বিখ্যাত সেই ভাষণ দিয়েছিলেন তা আমি জানি না। পরে আমি জেনেছি ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

১৩টি নারী আসনসহ জাতীয় পরিষদে আসন সংখ্যা ছিল ৩১৩টি (৩০০+১৩= ৩১৩)। এর মধ্যে অবিভক্ত পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল– পূর্ব পাকিস্তানের আসন সংখ্যা ছিল ১৬৯টি (১৬২+৭= ১৬৯)। অর্থাৎ ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বরের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পায় ১৬৭টি আসন।

ওই নির্বাচনে বহু রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেছিল। সামরিক আইনের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ওই নির্বাচন। এতে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন পাওয়ার পর বাকি ২টি আসন পায় পিডিপি (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি)। ৭ ডিসেম্বরের নির্বাচনের পর তৎকালীন সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন।

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের পিপিপি (পাকিস্তান পিপলস পার্টি) নেতা জেড এ ভুট্টো এবং পাকিস্তান সামরিক চক্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে অর্থাৎ আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ষড়যন্ত্রকারীদের হাতের পুতুলে পরিণত হলেন সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ ১টা ৫ মিনিটে আকস্মিক এক বেতার ঘোষণায় ৩ মার্চ অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়। জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত হওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গর্জে ওঠে বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তান)।

৩ মার্চ পল্টনে ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগের সভায় প্রধান অতিথি বঙ্গবন্ধু আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আমি থাকি আর না থাকি, বাংলার স্বাধীকার আন্দোলন যেন থেমে না থাকে। বাঙালির রক্ত যেন বৃথা না যায়। আমি না থাকলে আমার সহকর্মীরা নেতৃত্ব দিবেন। তাদেরও যদি হত্যা করা হয়, যিনি জীবিত থাকবেন, তিনিই নেতৃত্ব দিবেন। যে- কোনো মূল্যে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে- অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।'

বঙ্গবন্ধু আগেই ঘোষণা করেছিলেন, ৭ মার্চ রোববার রেসকোর্স ময়দানে তিনি পরবর্তী কর্মপন্থা ঘোষণা করবেন। ৪ থেকে ৬ মার্চ সকাল ৬টা থেকে ২টা পর্যন্ত সারা দেশে হরতাল পালনের আহ্বান জানালেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দুর্বার গতিতে আন্দোলন এগিয়ে চলল। সারা দেশে তখন একজন মাত্র নেতা। দেশের শতকরা ৯৮ জন মানুষের ভোটে নির্বাচিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দেশের সামরিক শাসন চালু থাকলেও সামরিক সরকারের কথা তখন কেউ শুনছে না। শেখ মুজিবুর রহমানের কথাই তখন আইন। তাঁর নির্দেশেই পরিচালিত হচ্ছে সমগ্র বাংলাদেশ।

সেই আন্দোলনমুখর পরিস্থিতিতে ঘনিয়ে এলো ৭ মার্চ। ওই দিন বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্স ময়দানে পূর্ব নির্ধারিত জনসভায় যোগদানের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ রওয়ানা দেয়। বাস, লঞ্চ, স্টিমার, নৌকা ও পায়ে হেঁটে বিপুল বিক্রমে রাজধানী ঢাকার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। আমিও যেন তাদের সঙ্গে রওয়ানা দেই। আমিও আসতে থাকি ঢাকায়। ইতিহাস মতে ২৬ ঘন্টার পায়ে হাঁটার পথ পেরিয়ে গামছায় চিড়ে গুড় বেঁধে ঘোড়াশাল থেকেও বিরাট মিছিল এসেছিলো সেই সভায়। বহু নারী, ছাত্রছাত্রী এমনকি অন্ধদেরও একটি মিছিল এসেছিলো বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার জন্য। এসেছিলেন হাজার হাজার বাউল। আহা! কোনো বধির কি সেখানে এসেছিলেন? তিনি হয়ত জানেন বঙ্গবন্ধুর কথার কোনো কিছুই শুনতে পাবে না। তারপরও এসেছেন বঙ্গবন্ধুকে একনজর দেখতে। জন জোয়ারে শামিল হতে।

জনসভার কাজ শুরু হতে তখনো অনেক সময় বাকি। বাঁধভাঙা মানুষের স্রোতে দুপুর হতে না হতেই ভরে ওঠে রেসকোর্সের ময়দান। রেসকোর্সের বৃহত্তর পরিসর পেরিয়ে জনস্রোত ক্রমেই বিস্তৃত হতে থাকে কয়েক বর্গমাইল এলাকা জুড়ে। মুহুর্মুহু গর্জনে ফেটে পড়েছে জনসমুদ্রের উত্তাল কণ্ঠ। লক্ষ কণ্ঠে এক আওয়াজ। বাঁধ না মানা দামাল হাওয়ায় সওয়ার লক্ষ কণ্ঠের বজ্র শপথ। লক্ষ হস্তে শপথের বজ্রমুষ্ঠি উত্থিত হচ্ছে আকাশে। বাতাসে পত পত করে উড়ছে বাংলার মানচিত্র অঙ্কিত সবুজ জমিনের উপর লাল সূর্যের পতাকা। দলের কেন্দ্রীয় নেতারা বক্তব্যের সাথে সাথে দুলে উঠছে বাঙালিদের সংগ্রামের প্রতীক লক্ষ লক্ষ বাঁশের লাঠি। মঞ্চ থেকে মাঝে মাঝেই স্লোগান তুলছেন সংগ্রাম পরিষদের নেতারা 'জয় বাংলা'। 'আপোশ না সংগ্রাম-সংগ্রাম-সংগ্রাম।' 'আমার দেশ তোমার দেশ—বাংলাদেশ বাংলাদেশ।' 'পরিষদ না রাজপথ-রাজপথ রাজপথ।' 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো-বাংলাদেশ স্বাধীন করো।' 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ো-বাংলাদেশ স্বাধীন করো।' এই হলো রমনা রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক সভার দৃশ্য। যে সভায় আমি ছিলাম না। অথচ যেন দেখতে পাই আমি সেখানে ছিলাম। আমিও তাঁদের সাথে গলা মিলিয়ে স্লোগান দিচ্ছি। বঙ্গবন্ধুকে একনজর দেখার জন্য ঠেলেঠুলে মঞ্চের সামনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছি। বঙ্গবন্ধুকে একপলক দেখার চেষ্টা করছি। কিন্তু আফসোস! সেখানে থাকার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

এদিকে বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্সের ভাষণ সরাসরি সম্প্রচার না করার প্রতিবাদে বেতারে কর্মরত বাঙালি কর্মচারীরা তাৎক্ষণিক ধর্মঘট শুরু করায় বিকেল থেকে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচারের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বেতার কর্তৃপক্ষ রেসকোর্স থেকে সরাসরি সম্প্রচারের পূর্ব ঘোষণা দিয়ে পরে তা বাতিল করে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সম্প্রচার করা হবে এ ঘোষণার পর সারা বাংলার শ্রোতারা অধীর আগ্রহে রেডিও সেট নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন।

বেলা ২টা ১০ মিনিট থেকে ৩টা ২০ মিনিট পর্যন্ত ঢাকা বেতারের দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করা হয়। রবীন্দ্র সংগীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' পরিবেশনের পর বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সম্প্রচার মুহূর্তে আকস্মিকভাবেই ঢাকা বেতারে তৃতীয়

অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সম্প্রচার না করার প্রতিবাদে ঢাকা বেতারের কর্মীরা কাজ করতে অস্বীকার করলে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েই অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বঙ্গবন্ধু মঞ্চে ওঠেন ৩টা ২০ মিনিটে। কিন্তু ফাল্গুনের সূর্য ঠিক মাথার উপর ওঠার আগে থেকেই এই স্লোগান চলছে। মঞ্চে মাইকে স্লোগান দিচ্ছেন ছাত্রলীগ নেতা আ স ম আবদুর রব, নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ ও আবদুল কুদ্দুস মাখন। স্লোগান দিচ্ছেন আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান আবদুর রাজ্জাক। স্লোগানের ফাঁকে ফাঁকে নেতৃবৃন্দ দিচ্ছেন টুকরো টুকরো বক্তৃতা। এরপরই স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা রাজনীতির কবি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাইকের সামনে এসে দাঁড়ান।

লক্ষ জনতার স্লোগানে স্লোগানে প্রকম্পিত তখন ঢাকার আকাশ-বাতাস। সে গগনবিদারী স্লোগান চলা অবস্থায় বঙ্গবন্ধু 'ভাইয়েরা আমার, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি' এই কথা বলে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ শুরু করেন। ভাষণের এক পর্যায়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষকে চারটি শর্ত দিয়ে ভাষণের শেষাংশে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।'

মহার্ঘ্য এই বাক্যটি বলতে বঙ্গবন্ধুকে এর আগে প্রায় একশটি বাক্য বলতে হয়েছে। শব্দ উচ্চারণ করতে হয়েছে এক হাজার বিরাশিটি। আর বঙ্গবন্ধুর মাত্র আট সেকেন্ডের ঘোষণায় শুরু হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম– 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' মাত্র ১৯ মিনিটের এই ভাষণে ৭ কোটি বাঙালির মনের মণিকোঠায় ছবি হয়ে গেলেন শেখ মুজিবুর রহমান। গড়ে উঠল দুর্বার ঐক্য, গড়ে উঠল সংগ্রামী চেতনা। তৈরি হলো জীবন উৎসর্গের প্রেরণা। যেন সেই থেকে সাত কোটি বাঙালি মানে শেখ মুজিবুর রহমান, ৭ কোটি বাঙালি মানে দেশ প্রেমের আদর্শ সৈনিক। ৭ কোটি বাঙালি মানে সমগ্র বাংলাদেশ।

৭ মার্চের ঐতিহাসিক সেই ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির জন্য মুক্তির আহ্বান। সেদিন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে আকাশস্পর্শী তর্জনী উঠিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে দেখিয়েছিলেন মহামুক্তির দূরদিগন্ত। যে দিগন্তে ছিল আশার আলো। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার দৃপ্ত শপথ।

হাজার বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে দিয়েছেন কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। মানুষের মতো বেঁচে থাকার অধিকার। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতন, নিপীড়ন থেকে মুক্তিকামী মানুষ পেয়েছে বিশ্বের বুকে উন্নত শিরে দাঁড়াবার সম্মান।

যে সভায় আমি ছিলাম না। অথচ যেন দেখতে পাই আমি সেখানে ছিলাম। আমিও তাঁদের সাথে গলা মিলিয়ে স্লোগান দিচ্ছি। বঙ্গবন্ধুকে একনজর দেখার জন্য ঠেলেঠুলে মঞ্চের সামনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছি। বঙ্গবন্ধুকে এক পলক দেখার চেষ্টা করছি। কিন্তু আফসোস! সেখানে থাকার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

পৃথিবীতে কেউ কেউ আসেন ইতিহাসের অধ্যায় হতে। বঙ্গবন্ধু এসেছিলেন ইতিহাস হয়ে। মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত ইতিহাসের পাতায় তাঁর মহৎ কর্মকাণ্ড, সংগ্রামী জীবনের ইতিকথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। প্রিয় মাতৃভূমির মাটি ও মানুষের ভালোবাসায় তিনি ধন্য। তাঁর কালজয়ী কীর্তি ঐতিহাসিক স্মৃতি হয়ে থাকবে প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে। পৃথিবীর মানচিত্রে যতদিন পদ্মা-মেঘনা, গোমতী-গড়াই, তুরাগ-তিতাস, মধুমতির অস্তিত্ব থাকবে ততদিন স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক হয়ে বেঁচে থাকবেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ঘুনিচক্রে ভুল করেও ভাবতে পারেনি, জীবিত বঙ্গবন্ধুর চেয়ে মৃত বঙ্গবন্ধু বাঙালির হৃদয়ে আরো বেশি শ্রদ্ধার আসন করে নেবে।

মানুষের সাম্রাজ্য তার কল্পনা। এজন্য আমি আমার চিন্তালোকে, কল্পনালোকে, ভাবনালোকে, জ্ঞানালোকে, স্বপ্নলোকে শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখি। শেখ মুজিবুর রহমান-এর ভাষণ শুনি। তাঁর হাত ধরে হাঁটি। তাই তো তাঁর হাত ধরে হাঁটার ইচ্ছেটা স্বপ্ন হয়েই আসুক। ঐতিহাসিক সেই জনসভায় উপস্থিত হওয়ার বাসনা আকাশ নীলে ভাসুক।

ডাকটিকিটে বঙ্গবন্ধু

মো. ইফতেখার হাসানাত

আমার এক বন্ধু কথায় কথায় একদিন বলেছিল 'আমাদের দেশে'তো একজন মানুষই আছেন যাকে নিয়ে কিছু ভাবা যায়, কিছু বলাও যায় কিংবা তাঁকে নিয়ে দুই-এক ছত্র কিছু একটা লেখাও যায়। তিনি হলেন আমাদের খুব কাছের মানুষ। মুক্তিযুদ্ধের অগ্রনায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেদিনকার এই কথাটুকু আমার মনে দাগ কেটেছিল। তার কল্যাণেই যে আমরা আজ বিশ্বের বুকে বাঙালি হয়ে বেঁচে থাকার অধিকার পেয়েছি তা অনস্বীকার্য। তাইতো সমাজের যে-কোনো ছোটো-বড়ো ক্রান্তিলগ্নে তাঁকে আমরা পেয়েছি আমাদের পাশে। এমনকি আমাদের ডাকটিকিট বা ফিলাটেলিক অঙ্গনেও রয়েছে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি। আর এগুলোই আজও আমাদেরকে এবং আগামী প্রজন্মকে বলে দিবে তিনি ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন, প্রত্যেক বাঙালির একজন প্রাণের মানুষ হয়ে।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয়, ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গঠিত হয়েছিল কয়েকটি তহবিল। তার মধ্যে একটি হলো তৎকালীন মুজিবনগর সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৮ (আট)টি বিভিন্ন মূল্যমানের (১০, ২০, ৭৫ পয়সা এবং ১, ২, ৩, ৫ ও ১০ টাকা) স্মারক ডাকটিকিট। এগুলো প্রকাশ হয়েছিল ১৯৭১-এর ২৯ জুলাই। আর এই ৮ (আট)টি ডাকটিকিটের মধ্যে ৫ টাকা মূল্যমানের ডাকটিকিটে নকশায় উৎকীর্ণ করা হয় মুক্তিযুদ্ধের অগ্রনায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি প্রতিকৃতি। উল্লেখ্য, এই ডাকটিকিটগুলোর নকশাবিদ লন্ডন প্রবাসী ভারতীয় শিল্পী শ্রী বিমান মল্লিক।

'বঙ্গবন্ধু'র যে তেজোদীপ্ত ভাষণটি এদেশের আপামর জনতাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল অকুতোভয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার। সেই '৭১-এর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ আজও আমাদের জীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার প্রধান চালিকাশক্তি। ভাষণটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং তাৎপর্য অনুধাবন করে ২৬ বছর (১৯৭১-১৯৯৭) পূর্তিতে বাংলাদেশ ডাকবিভাগ ১৯৯৭ সালের ৭ মার্চ প্রকাশ করে একটি ডাকটিকিট। বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণদানরত ছবি শোভিত ৪ (চার) টাকা মূল্যমানের একটি বর্ণিল স্মারক ডাকটিকিটসহ একটি মনোরম উদ্‌বোধনী খাম ও বিশেষ সীলমোহর প্রকাশ করে। এই স্মারক ডাকটিকিটটির নকশাবিদ আনোয়ার হোসেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শহিদ হওয়ায় দীর্ঘ ২১ বছর পর (১৯৭৫-১৯৯৬) বাংলাদেশ ডাকবিভাগ প্রথমবারের মতো ১৯৯৬ সালের ১৫ আগস্ট একটি ডাকটিকিট ও স্মারকসহ উদ্‌বোধনী খাম প্রকাশ করে। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি শোভিত ৪ (চার)

টাকা মূল্যমানের ৪২ মি. মি. x ৩২ মি. মি সাইজের একটি মনোজ্ঞ স্মারক ডাকটিকেট এবং একটি উদ্‌বোধনী খাম। এরজন্য ব্যবহৃত হয় একটি সীলমোহর। ডাকটিকিটটির নকশা করেন জনাব মতিউর রহমান।

স্বাধীনতার ২৫ বছর পূর্তিতে বাংলাদেশ ডাকবিভাগ ১৯৯৭ সালের ২৬ মার্চ পুনরায় ৪ (চার) টাকা মূল্যমানের ৪৮ মি.মি. x ৩২ মি.মি. আকারের একটি মনোরম স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করে। যার নকশায় উৎকীর্ণ করা হয় জাতীয় পতাকা হাতে একদল উল্লসিত জনতার মাঝে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি। এই ডাকটিকিটটির নকশা করেন মতিউর রহমান।

আপন সত্তা তথা বাঙালি হয়ে বিশ্বের বুকে বেঁচে থাকার অধিকারের সেই দিনটি হলো ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমাদের মহান বিজয় দিবস। যা কিনা আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার। মহান বিজয় দিবসের রজতজয়ন্তীতে (১৯৭১-১৯৯৬) বাংলাদেশ ডাকবিভাগ ১৯৯৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর 'বিজয় দিবসের রজতজয়ন্তী' শিরোনামে ৪ ও ৬ টাকা মূল্যমানের দুটি বর্ণিল স্মারক ডাকটিকিটসহ একটি উদ্‌বোধনী খাম প্রকাশ করে যথাক্রমে ৩২ মি.মি. x ৪২ মি.মি. এবং ৪২ মি.মি. x ৩২ মি. মি. সাইজের খাম দুটিতে ব্যবহৃত হয় একটি বিশেষ সীলমোহর। উল্লেখ্য, এই দুটি ডাকটিকিটের নকশায় বিজয়ের আনন্দে উল্লাসিত জনতার ছবি উৎকীর্ণ করা হয়। উদ্‌বোধনী খামটিতে রয়েছে 'জাতীয় স্মৃতিসৌধ' -এর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে 'বঙ্গবন্ধু' হাত মেলে নীল আকাশে উড়াচ্ছেন সাদা কবুতর। এই ডাকসামগ্রীগুলোর নকশাবিদ ছিলেন মোঃ শামছুদ্দোহা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭৭তম জন্মবার্ষিকীতে (১৯২০-১৯৯৭) এ দেশের সর্বস্তরের মানুষ তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে জানায় একরাশ ফুলের শুভেচ্ছা। একজন মহামানবের তথা বঙ্গবন্ধুর ৭৭তম জন্মবার্ষিকীতে বাংলাদেশ ডাকবিভাগ ১৯৯৭ সালে ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি শোভিত ৪ টাকা মূল্যমানের একটি বর্ণাঢ্য স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে।

তাছাড়া এর সাথে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি শোভিত একটি উদ্‌বোধনী খামও প্রকাশিত হয়। খামটিতে লিপিবদ্ধ করা হয় পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও ছড়াকার শ্রী অন্নদা শংকর রায়-এর কবিতার প্রথম দুইটি লাইন- যতদিন রবে পদ্মা, মেঘনা, গৌরি, যমুনা বহমান / ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের আঁধারে পাকবাহিনী যখন গণহত্যায় লিপ্ত তখন অন্যদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হন। শুরু হয় তার প্রহসনমূলক বিচার। দেশদ্রোহী সাব্যস্ত করে রায়ে তাঁকে দেওয়া হলো

মৃত্যুদণ্ড। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়, নয়মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ হলো স্বাধীন। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের সকল মানুষের মনে তখন একটাই প্রশ্ন 'বঙ্গবন্ধু কোথায়?'

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে নিঃশর্তে মুক্ত হয়ে মৃত্যুপথযাত্রী মুক্তিযুদ্ধের অগ্রনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফিরে এলেন স্বদেশ ভূমি বাংলাদেশে। পূর্ণ হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এই বিশেষ দিনটিকে বাংলাদেশের ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় করে রাখার জন্য বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ২০১১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস শিরোনামে দুইটি ৫ (পাঁচ) টাকা ও একটি ১০ (দশ) টাকা মূল্যমানের মোট তিনটি স্মারক ডাকটিকিটসহ একটি উদ্‌বোধনী খাম প্রকাশ করে। ৩৭ মি.মি. x ৩৭মি.মি. (প্রতিটি) সাইজের এই তিনটি স্মারক ডাকটিকিটের মধ্যে দুইটির (৫ টাকা মূল্যমানের) নকশায় উৎকীর্ণ করা হয়, স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আনন্দে হাসি-কান্না বিজড়িত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি। অপরটিতে (১০ টাকা মূল্যমানের) ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) গণসংবর্ধনায় আগত লক্ষাধিক জনতার উদ্দেশে দু'হাত নেড়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু তারই ছবি। দৃষ্টিনন্দিত এই তিনটি স্মারক ডাকটিকিটগুলোর নকশাবিদ মতিউর রহমান এবং সামগ্রিক ডাক সামগ্রীগুলোর ডিজাইনার আনোয়ার হোসেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাতের শেষ প্রহর। এই রাতেই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রনায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে শহিদ হন তাঁর নিজ বাসভবনে।

তাঁর ৩৪তম শাহাদত দিবস স্মরণে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ২০০৯ সালের ১২ আগস্ট। ১৯৭৫ সালের ১৫ ১ টি সীটলেট (Sheet Let) সহ স্মারক ডাকটিকিট এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি শোভিত একটি ফোল্ডার প্রকাশ করে। বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের আরো ১৭ জনের ১৭টি ছবি (প্রতিটি ৪২ মি. মি. x ৩২ মি.মি. সাইজের) শোভিত ডাকটিকিট এবং ১৫ আগস্ট 'জাতীয় শোক দিবস' ২০০৯ শিরোনামে ২০৫ মি.মি. x ২০০ মি.মি. আকারে সীললেটটি প্রকাশ হয়েছিল।

প্রকাশিত ১৭টি ডাকটিকিট এর মধ্যে 'বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি শোভিত ডাকটিকিটটির মূল্য ১৫ (পনের) টাকা এবং অপর ১৬টি ডাকটিকিটের প্রতিটির মূল্য ৩ (তিন) টাকা করে নির্ধারিত ছিল মাত্র। যেসব ছবি উৎকীর্ণ করা হয় সেগুলো সবই

বাংলাদেশ পোস্ট অফিস (জিপিও)-এর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ১৯৯৭ সালের ১৫ আগস্ট, ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি শোভিত ১০ (দশ) পয়সা মূল্যমানের যে পোস্টকার্ডটি প্রচলিত ছিল সেটিকে ওভারপ্রিন্ট করে বাজারে চালু করে। এই ক্ষেত্রে পোস্টকার্ডটির পূর্ব মূল্য ১০ পয়সার পরিবর্তে ১ (এক) টাকা নির্ধারণ করা হয় মাত্র।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের দরবারে আত্মপ্রকাশ করলো কিন্তু বাংলাদেশ ডাকবিভাগ তাদের কার্যক্রম শুরু করেই ১৯৭২ সালের ১৮ এপ্রিল। এই উপলক্ষে ২৬ মি. মি. x ২২ মি.মি. সাইজের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি শোভিত ১৩৯.৫ মি.মি. x ৮৮ মি.মি. সাইজের ১০ (দশ) পয়সা মূল্যমানের হালকা সবুজ রঙের একটি

'পোস্টকার্ড' ইস্যু করে। এরপর উপরোক্ত পোস্টকার্ডটির সার্বিক দিক (নকশা, পরিমাপ এবং অন্যান্য উপকরণ) ঠিক রেখে ১৯৭৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি একটি 'জবাবী' পোস্টকার্ড প্রকাশিত হয়। ঐ বছরই ৩ মে প্রকাশ করে পাশাপাশি লাগানো চারটি পোস্টকার্ড-এর একটি স্ট্রিপ। ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত

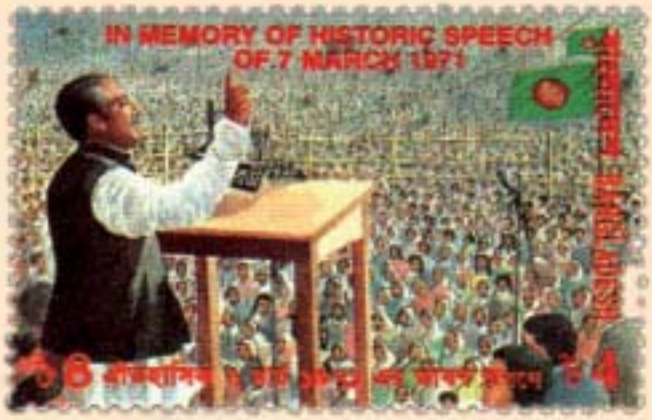

হয় দ্বৈত একটি পোস্টকার্ড যাতে ছিল দুটি পোস্টকার্ড (সাধারণ) ও দুইটি জবাবী পোস্টকার্ড। 'বঙ্গবন্ধু'র প্রতিকৃতি শোভিত এই পোস্টকার্ডগুলো (১৯৭২-১৯৭৫) মুদ্রিত হয় ভারতে।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর সুদক্ষ কূটনৈতিক তৎপরতা, কঠোর পরিশ্রম এবং অসাধারণ কর্মদক্ষতার গুণে ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ লাভ করে জাতিসংঘ বা UNO এর সদস্যপদ। জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের ২৫ বছর পূর্তিতে বাংলাদেশ ডাকবিভাগ ১৯৯৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর একটি স্মারক ডাকটিকিটসহ প্রকাশ করে একটি উদ্‌বোধনী খাম। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিসহ 'জাতিসংঘ'-এর মনোগ্রাম শোভিত ৬ (ছয়) টাকা মূল্যমানের ৩২ x ৪২ মি.মি. আকারে বর্ণিল ডাকটিকিটটির নকশাবিদ জনাব আনোয়ার হোসেন।

বঙ্গবন্ধুর স্মরণে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ যে ক'টি স্মারক ডাকটিকিট, উদ্‌বোধনী খাম 'সীটলেট' এবং ফোল্ডার প্রকাশ করেছে সেগুলো সবই অফসেট প্রক্রিয়ায় মুদ্রিত হয়েছে গাজীপুরে (উপজেলা) দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন লি. -এ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্মরণে যে ক'টি ডাকসামগ্রী (স্মারক ডাকটিকিট, উদ্‌বোধনী খাম, সীটলেট এবং ফোল্ডার) প্রকাশিত হয়েছে এগুলো যুগ থেকে যুগান্তরে বলতে থাকবে- তুমি রবে নীরবে অন্তরে মম।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা

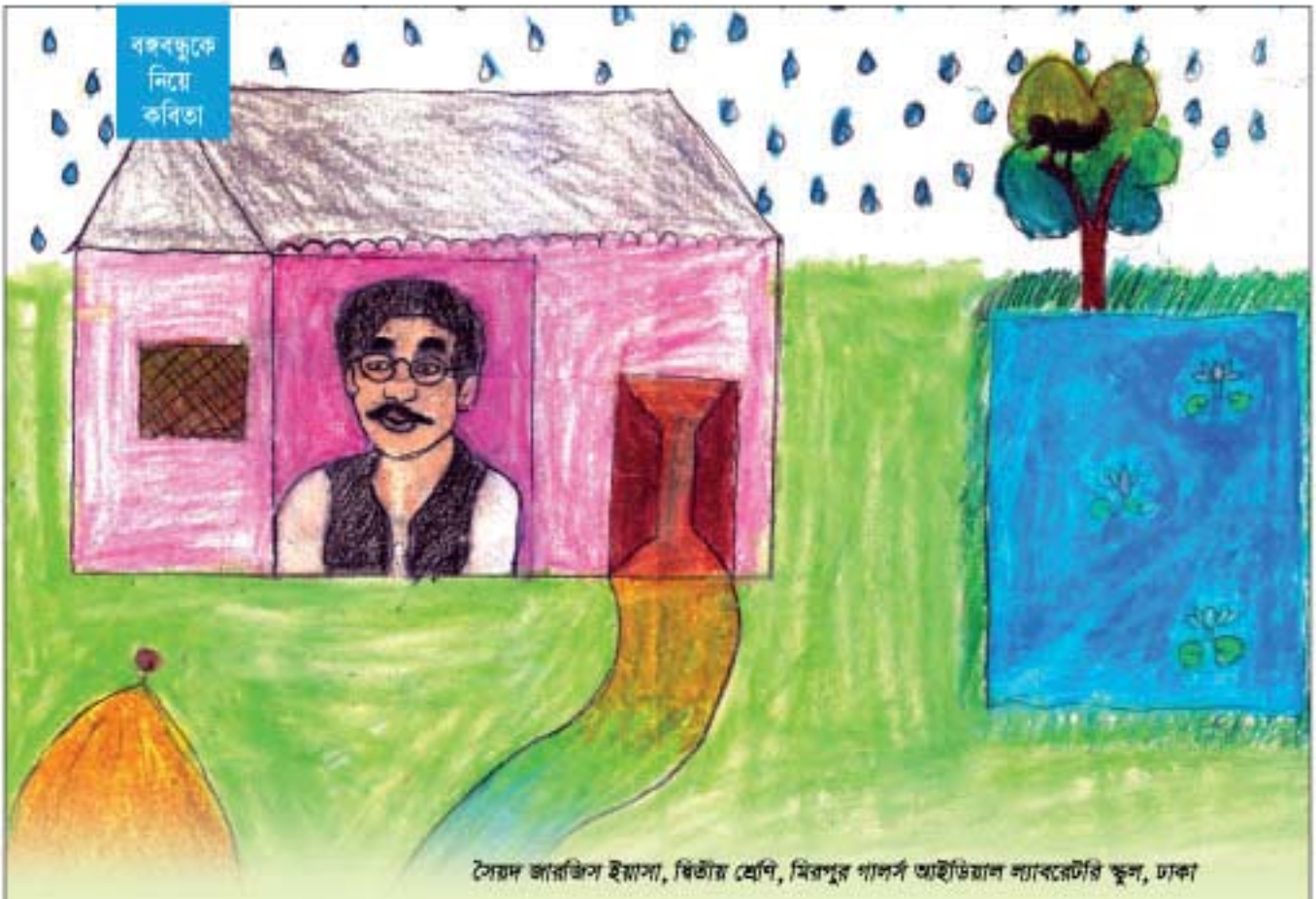

সৈয়দ জারজিস ইয়াসা, দ্বিতীয় শ্রেণি, মিরপুর গালর্স আইডিয়াল ল্যাবরেটরি স্কুল, ঢাকা

উঠল যেন রবি

সৈয়দ শফিউল আজম

আঁকল বাড়ি খুকুমনি
আঁকল পাশে পুকুর।
পানি দিল সে পুকুরে
যেন স্বচ্ছ মুকুর।
টিনের চালে বৃষ্টি ঝরার
দৃশ্য এঁকে শেষে।
গাছের ডালে কাক এঁকেছে
ভেজা ভেজা বেশে।
তবু দেখে বাড়ি কেমন
হয়ে আছে ম্লান
খুকু তখন চিন্তা করে
বদলাবে কি প্লান?
হঠাৎ করেই খুকুর মনে
ফিরে আসে খেই।
পায় খুঁজে সে এ বাড়িতে
কোন জিনিসটা নেই।
আঁকল শেষে দেয়াল জুড়ে
বঙ্গবন্ধুর ছবি।
উদ্ভাসিত আলোকিত
উঠল যেন রবি।
পালটে গেল মুহূর্তেই
সে বাড়িটার রূপ
খুকুও সে দৃশ্য দেখে
মৌন অবাক চুপ।

মুজিব মুজিব ডাক পাড়ি

আলম তালুকদার

মুজিব মুজিব ডাক পাড়ি
মুজিব এখন কার বাড়ি
ঘুমিয়ে আছে টুঙ্গিপাড়ায়
ওটা যে তাঁর নিজ বাড়ি।

যে মাটিতে জন্ম হলো
ঘুমিয়ে সেই মাটিতে
এখনো দেশ চালায় মুজিব
বসে শীতলপাটিতে।

মুজিব মুজিব ডেকো না
মুজিব কোথায় দেখো না?

মুজিব আছে বাংলাদেশের
সবুজ রাঙা ঘাসে
যখন তোমার হয় প্রয়োজন
তখন মুজিব আসে।

শিশু প্রেমী বঙ্গবন্ধু

আমিরুল হক

শিশু প্রেমী বঙ্গবন্ধু
ভাবতেন সর্বদাই
শিশুর জন্য বাসযোগ্য
নিরাপদ স্বদেশ চাই।
মুক্তমনে চলবে বলবে
গাইবে খুশির গান
হাসবে খেলবে দেখবে তারা
শিখবে অফুরান।
শিশুর মাঝে দেখতেন তিনি
উন্নয়নের ছবি
কেউবা হবে ইঞ্জিনিয়ার
কেউবা হবে কবি।
কেউবা আবার বুদ্ধিদীপ্ত
নাম করা ডাক্তার
কেউবা হবে রাজনীতিবিদ
কেউবা ব্যারিস্টার।
বাস্তবতার মধ্যে শিশুর
জীবন উঠবে গড়ে
অগ্রগতির চাকা সচল
থাকবে জীবন ভরে।
শিশুর জীবনমান উন্নয়নে
সবচেয়ে প্রয়োজন
বঙ্গবন্ধু শিশুনীতি
করেন প্রণয়ন।
শিশু অধিকার নিশ্চিত হলে
দূর হবে আঁধার
শিশুরাই মানুষ হয়ে নেবে
দেশের দায়িত্বভার।
বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে
শিক্ষার বিকল্প নাই
সু-শিক্ষায় শিক্ষিত হলে
মিলবে সুখের ঠাঁই।

শেখ মুজিবের নামটা

মো. মনিরুজ্জামান (মনির)

মুজিব নামের গান শোনা যায়,
দোয়েল পাখির শিসে।
শেখ মুজিবের নামটা সবার,
রক্তে গেছে মিশে।

মুজিব নামের ঢেউ উঠেছে,
অথৈ সাগর জলে।
আকাশ-বাতাস-পাহাড়-নদী,
মুজিবের নাম বলে।

মুজিব নামের সুর শোনা যায়,
একতারার ঐ তারে।
আজো সবাই মুজিব নামে,
ডাকে বারেবারে।

শেখ মুজিবুর হীরার টুকরা,
খুব বেশি তাঁর দামটা।
বুকের ভিতর লালন করি,
শেখ মুজিবের নামটা।

বড়োদের কাছে শুনে তোমাদের ‘চোখে’ দেখা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২৬ মার্চ ২০১৭ উপলক্ষে নবারুণ চেয়েছিল যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি, সেইসব খুদে বন্ধুর চোখ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে দেখতে। আর তাই বন্ধুদের অনুরোধ করা হয়েছিল, পরিবারের বা এলাকার বড়োদের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের সত্য ঘটনা জেনে লিখে পাঠাতে। এতে অন্যরাও জানবে সেই ঘটনা।

পাঁচ খুদে বন্ধুর লেখা একাত্তরের স্মৃতিচারণ থাকছে আর সব বন্ধুদের জন্য। স্বাধীন বাংলাদেশ পেতে আমাদের পূর্বপুরুষরা কত কষ্ট করেছেন, খুদে বন্ধুদের লেখায় ফুটে উঠেছে সেই ইতিহাস। আশা করছি তোমাদের চেতনাকে সমৃদ্ধ করবে লেখাগুলো।

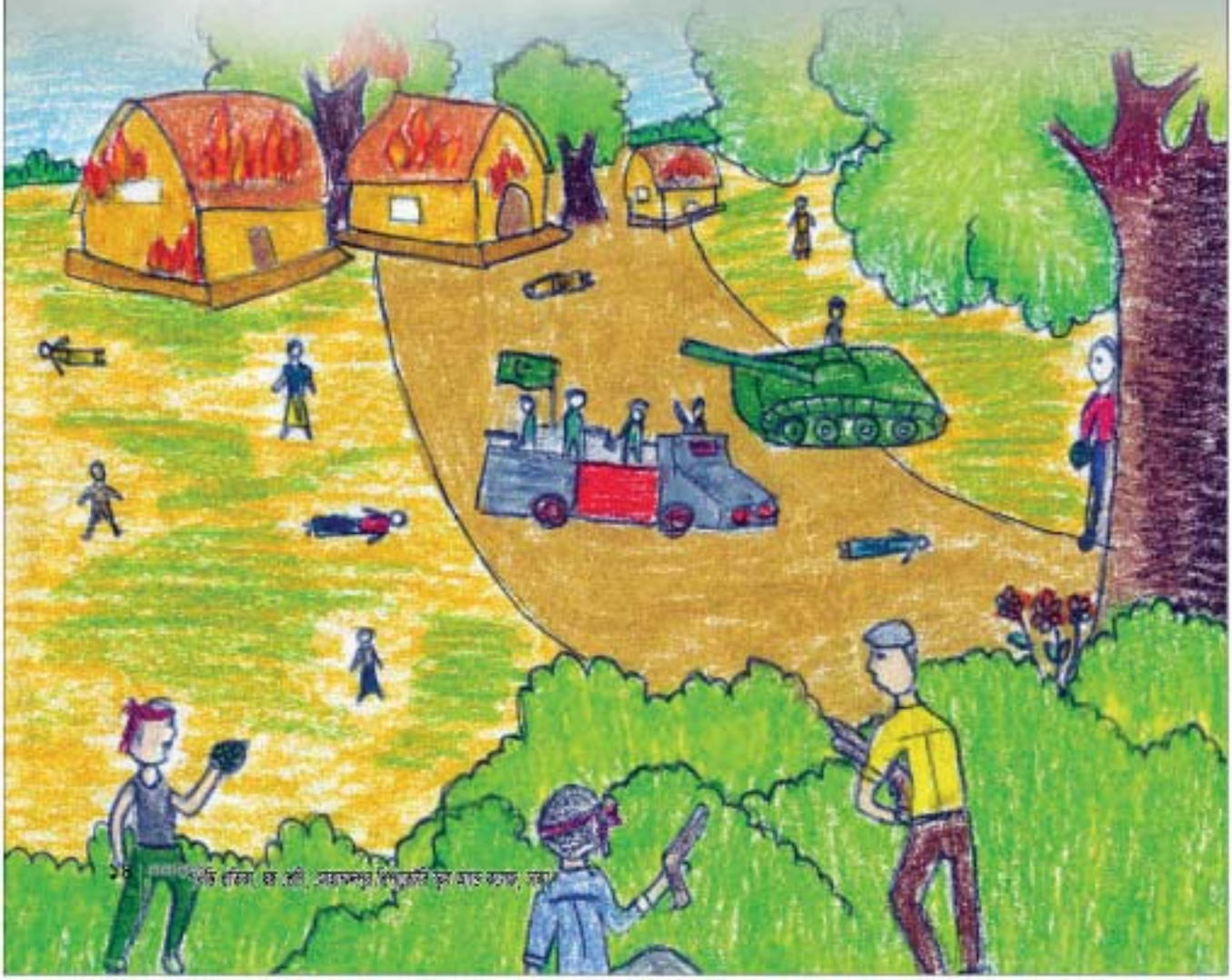

ছোটোদের একাত্তর

আমার চোখে মুক্তিযুদ্ধ

নিতু চৌধুরী

লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি বাংলার স্বাধীনতা । তাদের মাঝে আমার দাদাও ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা ।

উনি আমার দাদার আপন মামাতো ভাই। তাঁর নাম মো. ইসমাইল হোসেন। টাঙ্গাইলের পাকুল্লায় তিনি বড়ো হয়েছেন। যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন তিনি এসএসসি পরিক্ষার্থী।

বঙ্গবন্ধুর ডাকে সেদিন যদি কেউ সারা না দিতো তবে কোনোদিনও আমরা স্বাধীনতা পেতাম না । ছাত্ররা যদি সেদিন যুদ্ধে না আসত তবে আমরা স্বাধীনতার স্বাদ পেতাম না। সেদিন মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহসের কারণেই আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ।

১৯৭১ সালের আগস্ট মাস। তখন আমার দাদা ১৮ বছরের তরুণ। এয়ার ফোর্সের অফিসার খালেক কমান্ডারের ডাকে সাড়া দিয়ে ভারতের শরনার্থী শিবিরে চলে দাদার প্রশিক্ষণ।

কমান্ডার আব্দুল খালেকের ডাকে ভারতের ইউথ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ শেষে ভারী গোলাবারুদ সহ ১১ টি নৌকা দিয়ে দাদাসহ অনেক মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশে পৌছায়। সহকারী কমান্ডার হিসেবে থাকেন আব্দুল কাদের। যমুনা নদী দিয়ে আসতে থাকে তাদের নৌবহর। বাসাইল থানার চারুরার জমিদার বাড়িতে তৈরি করে তাদের নতুন ক্যাম্প। সব মুক্তিযোদ্ধারা এসে এখানে জায়গা নেয়। গুপ্তচর হিসেবে তারা ব্যবহার করে একেবারে ছোট্ট একটি শিশুকে। পরে তার পরিচয় পাওয়া যায়নি।

বংশাই নদীর উপর দিয়ে শুরু হয় তাঁদের নতুন যাত্রা। নেতৃত্বে থাকে কমান্ডার আব্দুল খালেক এবং সহকারী কমান্ডার আব্দুল কাদের।

বংশাই নদীর পাড় ঘেসে ওঁৎ পেতে থাকা পাকিস্তানিদের সাথে শুরু হয় যুদ্ধ। গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধের সময় নদীর পাড়ের উপরে উঠে যাওয়া এক মুক্তিযোদ্ধা গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। দাদার কোল জুড়ে তখন রক্ত আর রক্ত। রক্ত গড়িয়ে গিয়ে পড়তে থাকে নদীর পানিতে। লাল হয়ে যায় নদীর পানি।

যুদ্ধ থামে না।

এক সময় পিছু হটতে বাধ্য হয় পাকিস্তানিরা। ৬ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধের সময় পাকিস্তানিদের লক্ষ করে গ্রেনেড ছোড়ার সময় আমার দাদা পায়ে প্রচণ্ড আঘাত পান। এখনও সে আঘাত স্পষ্ট। খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটা তার সঙ্গী হয়ে ওঠে সারাজীবনের।

টাঙ্গাইল মুক্ত দিবস, '৭১ এর ১১ ডিসেম্বর। বীর বেশে দাদা বাড়ি ফিরে আসে রক্তের দাগ নিয়ে। স্বাধীন হয় একে একে পুরো বাংলা। কিন্তু ফিরে আসেনি অনেক স্বজন, অনেক আপনজন।

আমাদের স্বাধীনতা নিয়ে আমরা গর্ব করি। দাদার মতো লাখো যোদ্ধাদের কারণেই আমার দেশ স্বাধীন হয়। আমাদের সকলেরই উচিত মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধা করা। আমার দাদার সাথে সব মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদদের প্রতিও রইলো অসীম শ্রদ্ধা।

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে
বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা
আমরা তোমাদের ভুলবনা ...

পঞ্চম শ্রেণি, চকপাড়া আইডিয়াল পাবলিক স্কুল, মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর

ছোটোদের একাত্তর

একাত্তরের দাদু ভাই

মুক্তিযুদ্ধের দুটো সত্য ঘটনা

তায়্যিবা ফেরদৌসি অনন্যা

আমি এবার ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে সপ্তমে উঠেছি। মুক্তিযুদ্ধের অনেক গল্প জানি আমি। গল্পগুলোর কিছু আমি বই পড়ে জেনেছি। কিছু জেনেছি আমার দিদা-দাদু ভাইয়ের কাছ থেকে। বইয়ের গল্পের চাইতে দিদা দাদুভাইয়ের কাছে শোনা সরাসরি গল্পগুলো আমার বেশি ভালো লেগেছে। আমার দিদা-দাদু ভাই মুক্তিযুদ্ধের সময়ের অনেক কিছুর সাক্ষী। আজ আমি আমার দিদা ও দাদু ভাইয়ের কাছ থেকে শোনা সত্য দুটো ঘটনা সবাইকে বলব।

প্রথম ঘটনা

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার দাদু ভাইয়ের বয়স ছিল আমার আব্বুর এখন যে বয়স তার চাইতে কম। আমার দিদার বয়স ছিল আমার আম্মুর এখন যে বয়স তার চাইতে কম। আমার আব্বু আম্মুর জন্মই হয়নি তখন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার চার মাস পরের কোনো একদিনের কথা। আমাদের গ্রামের রাজাকার জমির মোল্লা সারা বাজারে ঢোল পিটিয়ে জানিয়েছে দিয়েছিল, আগামীকাল সকালে গ্রামের সকল যুবককে কোদাল আর টুকরি নিয়ে সকাল ছয়টার মধ্যে গ্রামের বাজারে এসে উপস্থিত হতে হবে। যে যাবে না তাকে ডাক বাংলায় ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে। ডাক বাংলা ছিল রাজাকারদের নির্যাতন ক্যাম্প। অনেক মানুষকে সেখানে নির্যাতন করে মেরেছে পাকিস্তানি সৈন্যরা। এখনো সেই ডাক বাংলা আছে, সেই নির্যাতনের সাক্ষী হয়ে। তো, জানের ভয়ে সকল যুবক সকাল ছয়টার আগেই বাজারে এসে উপস্থিত হয় কোদাল আর টুকরি নিয়ে। রাজাকার জমির সবাইকে গাড়িতে করে আমাদের বাড়ি থেকে পনেরো বিশ কিলোমিটার দূরে চারখাই নিয়ে আসে। সেখানে সবাইকে নামিয়ে দেয় বাংকার তৈরি করার জন্য মাটি কাটার কাজে। বাংকার হচ্ছে– যে গর্তে লুকিয়ে থেকে যুদ্ধ করা হয়। জানের ভয়ে সবাই বিনে পয়সায় বাংকার তৈরির জন্যে মাটি কাটতে থাকে। রাজাকার জমির কিছুক্ষণ পরপর গালি দিয়ে আরো জোরে কাজ করতে বলে। সবাই খালি পেটে মাটি কাটতে থাকে। ঘাম ঝরতে থাকে, পানির পিপাসা লাগে, কিন্তু পানি খাওয়ার সুযোগ দেয় না রাজাকার। কষ্টে বুক ফেটে যায়। সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসে। তখন আমাদের পাশের গ্রামের আরেক বড়ো রাজাকার বছন হাজি- যে ছিল এই এলাকার সব রাজাকারের নেতা, সে সিলেট শহর থেকে বিয়ানীবাজার যাচ্ছিল। সে দেখল- তার এলাকার যুবকদেরকে দিয়ে মাটি কাটাচ্ছে চামচা রাজাকার জমির মোল্লা। বছন হাজি জমিরকে ধমক দিয়ে সবাইকে বাড়ি পৌঁছে দিতে বলে। অনেক রাতে আমার দাদুভাই বাড়ি ফিরে আসেন। আমার দিদা তখন এক বছর বয়সের আমার ফুপি পারভিনকে নিয়ে কাঁদছেন আর কাঁদছেন। দিদার টেনশন, রাজাকার কাজ করাতে নিয়ে গেছে দাদু ভাইকে। জীবিত ফিরবেন কি না সে জন্যে দিদার এই হাহাকার। অনেক রাতে ভীষণ ক্লান্ত আমার দাদু ভাই যখন ঘরে ফিরেন, তখন আমার দিদা অনেক খুশি হন। ঘরে তেমন কোনো খাবারও ছিল না। সামান্য কিছু ভাত আর তরকারি ছিল। এটুকু খেয়ে আমার দাদু ভাই ঘুমিয়ে পড়েন। এই ঘটনাটি বলার সময় আমার দাদু ভাই কেঁদে ফেলেন। দাদু ভাইয়ের কান্না দেখে আমার দিদারও চোখে পানি চলে আসে। আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় দাদু-দিদার চোখে পানি দেখে আমিও কেঁদে ফেলি। তখন বুঝতে পারি, কত কষ্টে পাওয়া আমাদের এই স্বাধীনতা।

দ্বিতীয় ঘটনা

এই ঘটনাটিও আমার দিলা দাদু ভাইয়ের কাছে শুনেছি। আমাদের বাড়িটি গ্রামের একেবারে পশ্চিমে হাওরের মাঝখানে। গ্রাম থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্নই বলা যায় আমদের বাড়িটিকে। গ্রামটাও কিছুটা বিচ্ছিন্ন থানা শহর থেকে। আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে সুলা নদী। নদীতে রাতে নৌকা পাওয়া যেত না বলে পাকিস্তানি সৈন্যরা রাতে গ্রামে ঢুকতে পারত না। পাশের অনেক গ্রামের মানুষ তাই নিরাপদে রাত কাটাবার জন্যে আমাদের বাড়িতে এসে থাকত। আমাদের বাড়ির ঝোপেঝাড়েও মানুষ রাত কাটাতো। শিশু কিশোরসহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ আসত আমাদের বাড়িতে। অনেক কষ্টে রাতটা পার করে, আবার সকাল হলে চলে যেত। আমার দিলা ও দাদুভাইসহ আমাদের বাড়ির অন্য দাদু ও দিলারা তাদেরকে সাধ্যমতো খাবার দাবার দিতেন। আমার দাদুভাইয়ের বড়ো এক ভাই রাজাকার নেতা বহন হাজির খুব কাছের মানুষ ছিলেন। এজন্যে আমাদের বাড়িতে রাজাকাররা পাঞ্জাবি নিয়ে আসেনি কখনো। তবে মাঝে মাঝে গ্রামের ছোটো রাজাকারেরা আসত ঘুরতে ঘুরতে। আমার দাদুভাই, তার ভাই এবং চাচাতো ভাইয়েরা শক্তিশালী ছিল বলে রাজাকাররা আমাদের বাড়ির কোনো ক্ষতি করেনি। সেই সুযোগে অন্য গ্রামের মানুষেরা রাতে নিরাপদে থাকত আমাদের বাড়িতে। তাদের অনেক কষ্ট হতো রাতে ঝোপঝাড়ে থাকতে। আমাদের উঠোন কিংবা বারান্দায় থাকার জায়গা থাকলেও কেউ থাকত না সেখানে। কারণ রাতে রাজাকারেরা গোপনে এসে ঘুরে যেতো আমাদের বাড়ি। এজন্যে লোকজন ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে থাকত। দিলা বলেন– 'অননারে, অনেক মানুষের কষ্টে পাওয়া আমাদের এ স্বাধীনতা, কোনোদিন এর অসম্মান করো না বোন।' আমি দিলাকে ছুঁয়ে শপথ করি– কোনোদিন স্বাধীনতাকে অসম্মান করব না। এ যে আমাদের সকলের আজীবনের সেরা অর্জন।

সপ্তম শ্রেণি, কলবা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বিয়ানীবাজার, সিলেট।

ছোটোদের একাত্তর

নানার মুখে যুদ্ধের কথা

অভ্র ফারিহা

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ। তার ও আগে আমার নানা আবদুল মতিন সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। যুদ্ধের ৩ মাস আগে বড়ো মা (নানার মা) ও বড়ো আব্বা (নানার আব্বা) নানাকে পাশের গ্রামের সেতারার সাথে বিয়ে দেন।

দেশের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। যে-কোনো মুহূর্তে কিছু একটা হয়ে যেতে পারে। ১৯৭০ সালের ৩ ডিসেম্বর নানা আর নানির বিয়ে হয়। বিয়ের পর ৩ দিন নানা বাড়িতে থাকেন। চাকরির জন্যে নানাকে ছুটতে হয় শহরে, নানা রাওয়াল পিন্ডিতেও কিছুদিন ছিলেন।

২৬ মার্চ যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে নানা আবার একদিনের জন্য আসেন গ্রামে। বিদায় বেলায় নানা নানিকে বলেন– সেতারা, বাবা-মাকে রেখে গেলাম দেখে রেখো, আর নিজেকেও সাবধানে রাখবে।

নানির হাতে তখনো বিয়ের মেহেদি, নানি একদৃষ্টিতে নানার মুখের দিকে চেয়েছিলেন। চলে যাবার সময় বললেন-- ফি আমানিল্লাহ, যাও। দেশকে স্বাধীন করে ফিরে এসো।

নানা তাঁর বাবা মাকে সালাম করে দোয়া নিলেন। আর বললেন—আম্মা, আপনাদের দোয়া থাকলে ঠিক পারব আমার দেশকে স্বাধীন করতে। আপনাদের বৌ মাকে দেখে রাখবেন। প্রয়োজন হলে ওকে ওর বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দিবেন।

বড়ো মা ও বড়ো আব্বা নানার মাথায় হাত রেখে দোয়া করে বললেন– যাও বাবা, ভিনদেশি হায়েনাদেরকে খতম করে নিজের দেশকে মুক্ত করে নিয়ে এসো।

নানা যুদ্ধে যায়। নানাকে সবাই মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার মতিন ভাই বলে চিনত। নানা যুদ্ধে গেছেন শুনে অনেকে এই বাড়ির দিকে অন্য চোখে তাকাতো। পরিবারের সবাইকে মেরে ফেলার হুমকিও দিত। কিন্তু

তাসনোভা আলম (নিশান), পঞ্চম শ্রেণি, আইডিয়াল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

কেউ ভয় পেতো না। অবস্থা খারাপ দেখলে নানিকে ওনার বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দিত।

যুদ্ধ শুরু হবার কিছুদিন পর নানা গ্রামের অনেক কৃষক শ্রমিক ছাত্রকে প্রশিক্ষন দিতেন। রাতের অন্ধকারে বাড়ি আসতেন। তা শুধু জানতো বড়ো মা আর নানি। আবার ভোর হবার আগেই চলে যেতো।

পাকবাহিনী আসছে এমন শোনা গেলেই সবাই সবার মতো পালিয়ে যেতো। নানিকে বড়ো মা কোঁপের ভিতরে, ধানের গোলাতে লুকিয়ে রাখতেন।

যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে নানার পায়ে গুলি লাগে। নানার সাথে যারা ছিল, কেউ কেউ যুদ্ধ চালিয়ে নিতে থাকে। দুজন মুক্তিযোদ্ধা নানাকে টেনে নিয়ে আসে আড়ালে।

নানার পা দিয়ে রক্ত ঝরছে। একজন মুক্তিযোদ্ধা মাথার গামছা ছিড়ে নানার পায়ে বাঁধে। এরপর নানাকে পাশের মুক্তিযুদ্ধের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। ১০/১৫ দিন নানাকে ওখানে থাকতে হয়।

বাড়িতে খবর আসে, নানি, বড়ো মা, বড়ো আব্বা নানাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে যায়। নানা খবর পাঠায়- তোমাদের আসতে হবে না। দুই মাস পর নানা একদিনের জন্য বাড়ি আসে। এর মধ্যে সুস্থ হয়েই আবার যুদ্ধে যায়। ৯ মাস পর দেশ স্বাধীন করে পতাকা উড়াতে উড়াতে গ্রামে ফিরে আসে।

নানার কাছে আমরা যুদ্ধের গল্প শুনি। নানা আমাদের একেক দিন একেক ঘটনা বলে। একবার নানা বলেন—তখন আমি কুমিল্লায় আসি। যুদ্ধ চলছে। রাতের অন্ধকারে যুদ্ধ চালাচ্ছি আমরা। পাকিস্তানিদেরকে দেশ থেকে তাড়াতে হবে যে করে হোক। এক নারী আমার কাছে জীবন ভিক্ষা চায়। আমরা শুনতে পারলাম সে পাকিস্তানিদের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে। ওকে বাঁচিয়ে রাখা ঠিক হবে না। নারী এক ব্যাগ সোনা গহনা এনে আমার হাতে দিয়ে বলে আপনি এগুলো নিয়ে যান বিনিময়ে শুধু আমাকে বাঁচতে দিন। আমি তা করিনি। হাতের ব্যাগটা নিয়ে থানায় জমা দিয়ে দিই। আরও বাঁচিয়ে তাকে রাখিনি।

নানার মুখে কথাগুলো শুনে আমরা যেন যুদ্ধের দিন-গুলো দেখতে পাই। নানাকে নিয়ে আমাদের গর্ব হয়। নানার মতো অনেকে যুদ্ধে গেছে। অনেকে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে। আমরা তাদের কথা স্মরণ করি। তাদের ত্যাগের বিনিময়ে এই দেশ আমরা পেয়েছি। দেশকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। আমরা জানি স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে রক্ষা করা অনেক কঠিন।

সপ্তম শ্রেণি, বটমলী হোম বালিকা বিদ্যালয়, তেঁজগাও, ঢাকা

ছোটোদের একাত্তর

সে এক ভয়ানক রাত

রুমান হাফিজ

প্রতিদিন কম হলেও দুই থেকে তিনবার বাসার পাশের টং দোকানটায় চা খেতে যাই। বাসায় এর চাইতে ভালো মানের চা হলেও কেন জানি তাতে আমার তৃপ্তি মেটে না। এর জন্য আমাকে আম্মুর বকা প্রতিনিয়ত গিলতে হচ্ছে। তবুও আমার এই অভ্যাসটা পরিবর্তন হচ্ছে না। আর হবেই বা কেমন করে! টং দোকানি মামাও আমাকে দেখলে ভালোভাবে গরম পানিতে কাপ ধুয়ে তারপর চা খেতে দেন। শুধু কি চা খেতে আসি? না, এখানে চা খেতে আসলে সত্য-মিথ্যা, চলতি-পুরানো অনেক কিছুই জানা ও শোনা হয়। পরিচয় ঘটে অনেক কিছুরই সাথে।

প্রতিদিনের মতো সেদিন বিকেলবেলা আমার এক বন্ধুকে নিয়ে চা খেতে আসি। তখন টং দোকানটায় তেমন লোকজন ছিল না বললেই চলে, আমরা বসার পর সেখানে বসা দুজনের একজন চা খেয়ে চলে গেলেও মতিন চাচা তখনো বসা।

মতিন চাচা আমাদের গ্রামের মুরব্বি, সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে। মতিন চাচার আরেক পরিচয় হচ্ছে তিনি হলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. ইসমাইল হোসেন। ১৯৭১ সালে দেশকে স্বাধীন করার লক্ষে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। মতিন চাচার অনেক কথাই দাদু মাঝেমধ্যে আমাকে বলতেন। তখন থেকেই আমার ভীষণ ইচ্ছে যদি সরাসরি মতিন চাচার কাছ থেকে এসব ঘটনা জানতে পারতাম। উনাকে অনেক সময় চলাফেরায় দেখতে পেলেও সাহস হয়ে ওঠেনি জিজ্ঞেস করার মতো। তবুও মনে মনে ভীষণভাবে ইচ্ছে পোষণ করতে থাকি।

আজ আর এই সুযোগ হারাতে দেবো না,নিজের মধ্যে সাহস সঞ্চার করে প্রথমেই সালাম দিয়ে চাচাকে জিজ্ঞেস করলাম– কেমন আছেন চাচা?

- হ,বাজান ভালো আছি। আর তোমরা?

- জি চাচা আমরাও ভালো আছি। চাচা কি এখানে আরো কিছু সময় বসবেন?

- নাহ্ তেমন না, এই তো উঠব। কেন বাজান কোনো দরকার?

- না চাচা তেমন কিছু না।

- কি ভয় পাচ্ছ নাকি? অসুবিধে নেই বলো।

- চাচা আপনি তো মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, আমাদের যদি সেই সময়ের কোনো ঘটনা বলতেন।

- অহ! এই কথা, কেন বলব না, তোমাদের বলতে পারলেই তো আমার আরো বেশি ভালো লাগে।

চা খেতে খেতে আমাদের বলতে লাগলেন চাচা–

স্বাধীনতার ডাক শুনার পর যখন সারা দেশের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ জীবন বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকসেনাদের প্রতিহত করে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে। সেই সময় আমি এবং গ্রামের আরো কয়েকজন চলে যাই মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিতে। বাড়িতে আমার একমাত্র স্ত্রী ছিল, বাবা-মা আগেই মারা যাওয়ায় আর কেউ নেই বললেই চলে।

সেই সময় আমি নতুন বিবাহ করেছি মাত্র, বছর খানেক হবে। স্ত্রীর কাছে কিছু টাকাপয়সা দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়ি।

প্রথমে আমাদের যেতে হয়েছে সীমান্তবর্তী দেশ ভারতের আসাম রাজ্যে, সেখানে আমিসহ আরো বেশ কতজনকে প্রাথমিক ট্রেনিং দেওয়া হয়। এর আগে কখনো অস্ত্র হাতে নেইনি। প্রথম দিকে খানিকটা ভয় পেলেও, আস্তে আস্তে সব ঠিকভাবে শিখে ফেলি। কিছুদিন ট্রেনিং করার পর আমার সাথে আরো দশ জন নিয়ে একটি ছোটো দল করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় যুদ্ধ করতে। আর আমাকে বানানো হয় সেই দলটির প্রধান।

সেই সময় আমি স্কুলে আট ক্লাস পর্যন্ত লেখাপড়া করেছি। তারপর নিজের ইচ্ছাতেই ছেড়ে দেই। যাই হোক, আমরা চলে আসি আমাদের অস্থায়ী ক্যাম্পে, আশপাশ সব ঘুরে দেখে নেই পাকসেনাদের অবস্থান আছে কি না। তখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে মাত্র। গ্রামে তখনো পাকসেনাদের আগমন হয়নি। তবুও আমরা আমাদের প্রস্তুতি নিতে থাকি।

পাকবাহিনী এখন পর্যন্ত এদিকে না আসলেও আমরা সবাই রাতের বেলা একসাথে ঘুমোতে যাইনি, কয়েকজন ঘুমিয়ে পড়লে বাকিরা পাহারারত থাকত।

সেদিন রাতে হঠাৎ গুলির শব্দে আমরা সবাই জেগে উঠি, পরপর কয়েকটি আওয়াজ শুনে আমাদের বুঝতে আর বাকি রইলো না যে পাকবাহিনী এদিকে আক্রমণ করতে এসে গেছে। আমি সবাইকে ঠিকঠাক মতো থেকে তাদের অবস্থান জানার চেষ্টা করলাম। একজনকে পাঠিয়ে দিলাম দেখে আসার জন্য। আর আমরা ক্যাম্প থেকে সরে গিয়ে অস্ত্রসহ নিরাপদে অন্যত্র চলে এলাম। যখন জানতে পারলাম ওরা পাশের বাগানবাড়ির টিলার উপর অবস্থান নিয়েছে এবং সেই বাড়িতে বসবাসরত সবাইকে গুলি করে বাড়ি ছাড়া করে দিয়েছে, তাদের কেউ কেউ মারাও গেছে তখন। সেখানেই ওরা আস্তানা গেড়ে নেয়।

সেদিন থেকেই আমরা বাগানবাড়িতে থাকা পাক সেনাদের শেষ করে দেওয়ার পরিকল্পনা করতে থাকি। বাগানবাড়ির চারপাশ আগে দেখে নেই। বাড়িটির একপাশ দিয়ে বয়ে গেছে সুরমা নদী, চারিদিকে ঘন গাছপালা দ্বারা আবৃত। অনেকটা টিলার মতোই বাড়িটি।

এরমধ্যে আমি বাড়িতে এসে স্ত্রীকে নিয়ে যাই সীমান্তবর্তী আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে। আমার গ্রাম থেকে সেখানে থাকাটা নিরাপদ তাই। তাকে সেখানে রেখে সন্ধ্যার দিকে আমি ক্যাম্পে ফিরি।

এসে দলের সবাইকে দেখে বেশ চিন্তিত মনে হলো। কী হয়েছে জানতে চাইলে তারা জানায়, আমাদের দলের ইয়াসিন মিয়াকে ধরে নিয়ে গেছে পাক সেনারা। কীভাবে যে নিয়ে গেল তা কেউই বলতে পারছে না। সেজন্য আমিও বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম, না জানি কী হয়! ইয়াসিন মিয়া আমাদের বিরুদ্ধে কোনো কিছু বলবে না এটা বিশ্বাস করি, কিন্তু ওদের সীমাহীন বর্বরতা সহ্য করতে হবে। এভাবে তো শেষ করে ফেলবে।

না এ হতে দেওয়া যায় না। আমরা আমাদের কমান্ডার হাবিব সর্দারের সাথে এ নিয়ে পরামর্শ করতে গেলাম। এদিকে পাকসেনারা সবুর মিয়াকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাদের আরো অনেক সৈন্য নিয়ে আসতে থাকে বাগানবাড়িতে। এটা আমাদেরকে আরো ভাবিয়ে তুলে।

কমান্ডার সাহেবের সাথে কথা বলার পর তিনি সেখানে যেভাবেই হোক, গেরিলা পদ্ধতিতে আক্রমণ চালাতে

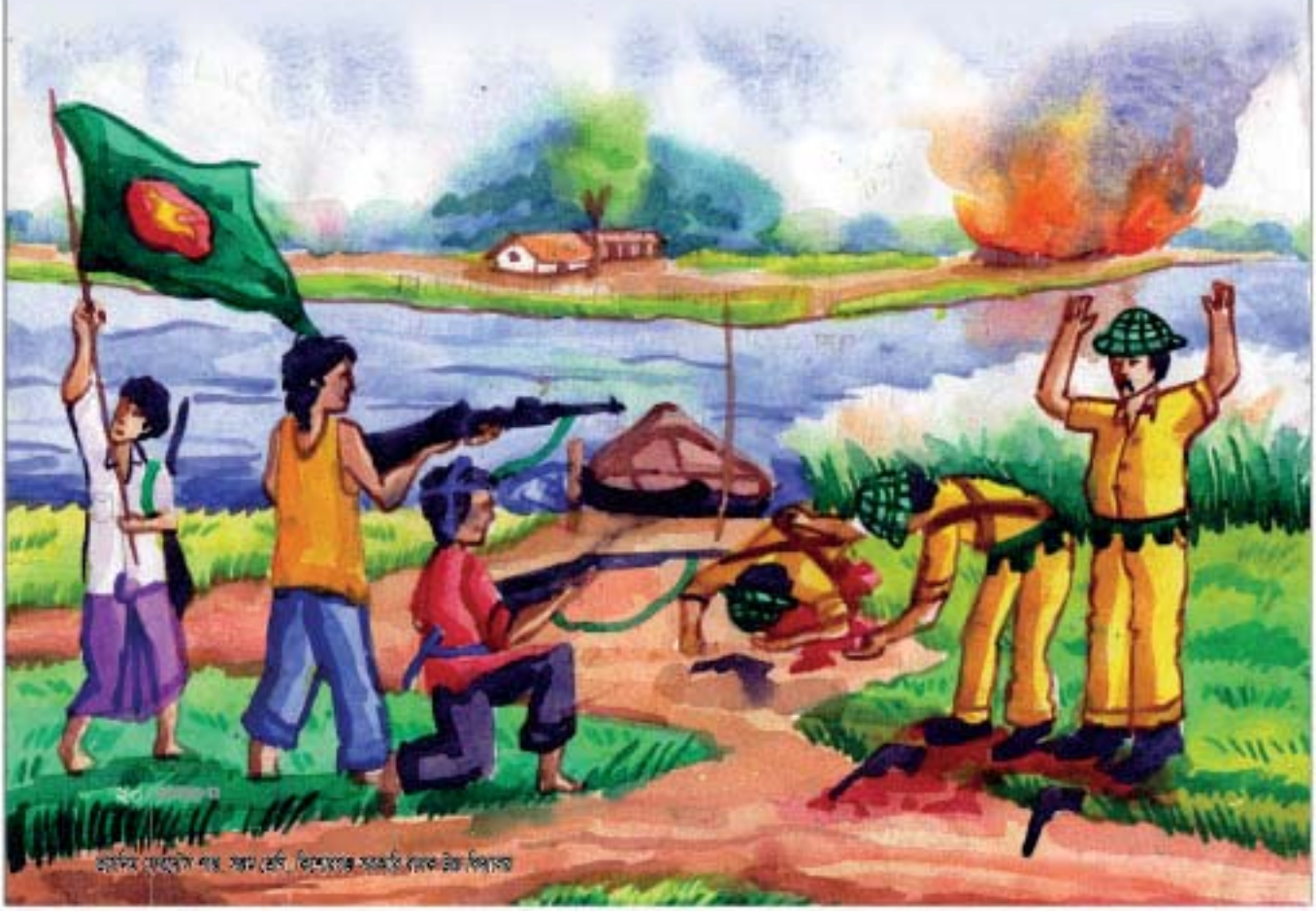

সেদিন রাতে হঠাৎ গুলির শব্দে আমরা সবাই জেগে উঠি, পরপর কয়েকটি আওয়াজ শুনে আমাদের বুঝতে আর বাকি রইলো না যে পাকবাহিনী এদিকে আক্রমণ করতে এসে গেছে। আমি সবাইকে ঠিকঠাক মতো থেকে তাদের অবস্থান জানার চেষ্টা করলাম। একজনকে পাঠিয়ে দিলাম দেখে আসার জন্য। আর আমরা ক্যাম্প থেকে সরে গিয়ে অস্ত্রসহ নিরাপদে অন্যত্র চলে এলাম। যখন জানতে পারলাম ওরা পাশের বাগানবাড়ির টিলার উপর অবস্থান নিয়েছে এবং সেই বাড়িতে বসবাসরত সবাইকে গুলি করে বাড়ি ছাড়া করে দিয়েছে, তাদের কেউ কেউ মারাও গেছে তখন। সেখানেই ওরা আস্তানা গেড়ে নেয়।

সেদিন থেকেই আমরা বাগানবাড়িতে থাকা পাক সেনাদের শেষ করে দেওয়ার পরিকল্পনা করতে থাকি। বাগানবাড়ির চারপাশ আগে দেখে নেই। বাড়িটির একপাশ দিয়ে বয়ে গেছে সুরমা নদী, চারিদিকে ঘন গাছপালা দ্বারা আবৃত। অনেকটা টিলার মতোই বাড়িটি।

এরমধ্যে আমি বাড়িতে এসে স্ত্রীকে নিয়ে যাই সীমান্তবর্তী আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে। আমার গ্রাম থেকে সেখানে থাকাটা নিরাপদ তাই। তাকে সেখানে রেখে সন্ধ্যার দিকে আমি ক্যাম্পে ফিরি।

এসে দলের সবাইকে দেখে বেশ চিন্তিত মনে হলো। কী হয়েছে জানতে চাইলে তারা জানায়, আমাদের দলের ইয়াসিন মিয়াকে ধরে নিয়ে গেছে পাক সেনারা। কীভাবে যে নিয়ে গেল তা কেউই বলতে পারছে না। সেজন্য আমিও বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম, না জানি কী হয়! ইয়াসিন মিয়া আমাদের বিরুদ্ধে কোনো কিছু বলবে না এটা বিশ্বাস করি, কিন্তু ওদের সীমাহীন বর্বরতা সহ্য করতে হবে। এভাবে তো শেষ করে ফেলবে।

না এ হতে দেওয়া যায় না। আমরা আমাদের কমান্ডার হাবিব সর্দারের সাথে এ নিয়ে পরামর্শ করতে গেলাম। এদিকে পাকসেনারা সবুর মিয়াকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাদের আরো অনেক সৈন্য নিয়ে আসতে থাকে বাগানবাড়িতে। এটা আমাদেরকে আরো ভাবিয়ে তুলে।

কমান্ডার সাহেবের সাথে কথা বলার পর তিনি সেখানে যেভাবেই হোক, গেরিলা পদ্ধতিতে আক্রমণ চালাতে

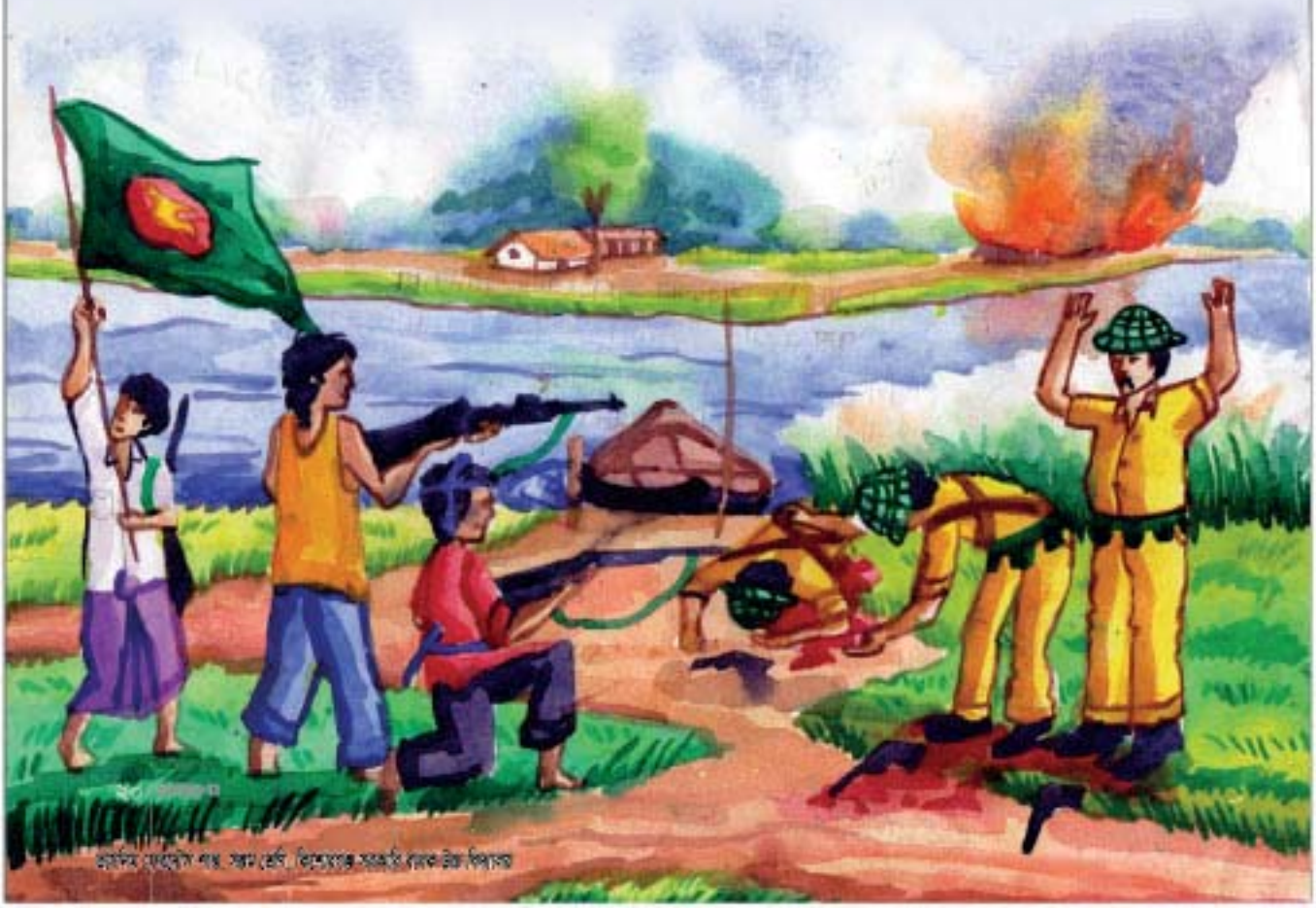

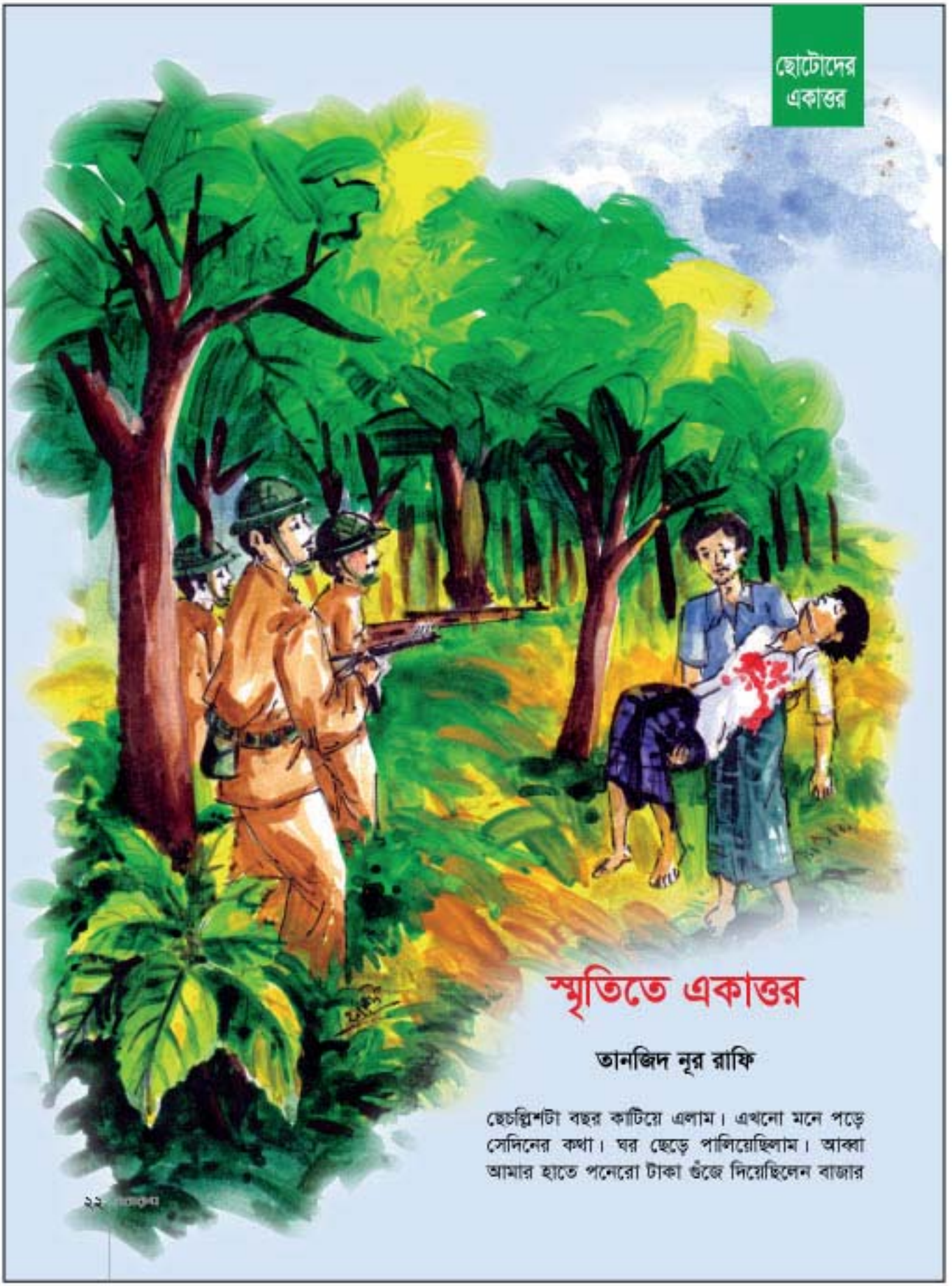

স্মৃতিতে একাত্তর

তানজিদ নূর রাফি

ছেচল্লিশটা বছর কাটিয়ে এলাম। এখনো মনে পড়ে সেদিনের কথা। ঘর ছেড়ে পালিয়েছিলাম। আব্বা আমার হাতে পনেরো টাকা গুঁজে দিয়েছিলেন বাজার

অর্পিতা রায় বর্মণ, তৃতীয় শ্রেণি, কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

আনতে। সেই পনেরো টাকা। পরনে একটা লুঙ্গি, একটা স্যান্ডো গেঞ্জি, পায়ে এক জোড়া স্পঞ্জের স্যান্ডেল। এই ছিল আমার সম্বল। ম্যাট্রিক লেভেলের ছাত্র হিসেবে কাজটি ছিল রীতিমতো ছেলেমানুষি ও বোকামি। তবুও বোকা হবার সবচেয়ে বড়ো সুবিধা হলো বিপদের পরিণতি সে লোকের মাথায় আসে না। আমার মতো আরো লাখ খানেক বোকা লোকের বোকামিতেই হয়ত আজ আমরা পেয়েছি আমাদের প্রাণের বাংলাদেশ।

আমি ট্রেনিং নিয়েছিলাম ভারতের বীরভূম ক্যাম্পে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধীনে। এখানে বাঙালিদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হতো। তাদের অধিকাংশেই ছিল গ্রামের যুবক। ভারতীয় প্রশিক্ষকেরা হিন্দিতেই কমান্ড দিতেন। রাইফেল চালানোর ট্রেনিং চলাকালীন বাম চোখ বন্ধ করে রাইফেলের দুটি নটের সাথে টার্গেটকে মিলিয়ে ফায়ার করতে হতো। তখন ভারতীয় সৈন্যরা কমান্ড দিতেন, 'বাঁয়ে আঁখে বন্ধ কারকে ফার্স্ট নট্‌সে সেকেন্ড নট মিলাও আউর ফায়ার করো'।

ফায়ার করার পর রাইফেলের ধাক্কা সামলাতে গিয়ে অনেকে পড়েছিল বিপদে। তবে প্রশিক্ষকেরা আমাদেরকে সবক্ষেত্রেই সাহায্য করেছিলেন। ফায়ার আর্মসের মধ্যে স্টেনগান, এসএলআর, থ্রিনটথ্রি রাইফেল এবং এলএমজি। বিস্ফোরকের মধ্যে গ্রেনেড ও প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ব্যবহারের কৌশল আমাদেরকে শেখানো হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং ছিল অত্যন্ত কষ্টকর। সেখানে খাবার তো বাঙালিদের পছন্দ হওয়ারই কথা না। তারপর ক্রলিং করা ছিল আরো কষ্টকর। এজন্যে অনেকেরই কনুই ও হাঁটুর চামড়া পর্যন্ত ছড়ে গিয়েছিল। একরাতে আমাদেরকে কাদার মধ্যে শুয়ে থাকতে হয়েছিল। গায়ে হালকা ব্যথা অনুভব করলাম,

অন্য পা দিয়ে সেই স্থানের কাদা সরিয়ে ফেললাম। সকালে উঠে পায়ের জমাট রক্ত দেখে কোনো সন্দেহ রইল না। সেটি মূলত ছিল জোঁক, যা পায়ের রক্ত শুষে নিয়েছিল।

আমরা ছিলাম ৮নং সেক্টরের অধীনে। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর জেনারেল ম আ মঞ্জুর।

মধুমতি নদীর পাড়। মুক্তিযোদ্ধারা খবর পেয়েছে এই অশান্ত নদী ধরে পাকিস্তানি আর্মিদের একটি সমর জাহাজ এগিয়ে আসছে। বেশ কিছুক্ষণ পর জাহাজটির দেখা পাওয়া গেল। কিন্তু ওরা ছিল আমাদের আওতার বাইরে। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাবে মুক্তিযোদ্ধারা সেই দূরত্ব আন্দাজ করতে পারেনি। তারা গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করলে হানাদার বাহিনী আমাদের অবস্থান টের পেয়ে যায়। জাহাজটি যখন তীরের কাছাকাছি এল তখন আমরা নদীর ঢালের ওপর। কিন্তু ততক্ষণে পাকিস্তানি সেনারা নদীর ঢালু অংশে পজিশন নিয়ে নিয়েছিল। জীবন বাঁচাতে আমাদেরকে সেদিন পিছিয়ে আসতে হয়েছিল। বহু মুক্তিযোদ্ধার লাশ আমরা সেবার উদ্ধার করতে পারিনি; নদীর তীরেই ফেলে এসেছিলাম।

আমারই একজন সহযোদ্ধা শোভনের কাছ থেকে শুনলাম মর্মান্তিক কাহিনি। চারপাশে প্রচণ্ড গোলাগুলি, আশপাশের গাছগুলোর ডালপালা ভেঙে যাচ্ছিল গুলির আঘাতে। মাথার ওপর দিয়ে গুলি যাওয়ার শোঁ শোঁ আওয়াজ। শোভনের পাশের ছেলেটির কাঁধে গুলি লেগেছিল-'পানি, পানি' বলে চিৎকার করছিল সে। সে সময় শোভনের সান্ত্বনা-'যাদুরে! এখন তো তোরে পানি দিতে পারব না। তাহলে তুই মরবি আমিও মরব।'

মুক্তিযুদ্ধে আমরা যোদ্ধারা অনেক মর্মান্তিক পরিস্থিতির শিকার হয়েছি। এগুলো তারই উদাহরণ। কিন্তু এ সকল পরাজয় এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি অতিক্রম করেই আমরা অর্জন করেছিলাম প্রিয় স্বাধীনতা।

যাঁর হাতে আমার স্কেচের হাতেখড়ি তিনিই মনোজ বিশ্বাস স্যার। তাঁর বর্ণনা অনুসারেই এই স্মৃতিচারণমূলক গল্পটি লিখিত। তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং বর্তমানে বিসিকে কর্মরত আছেন।

দশম শ্রেণি, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক স্কুল

স্বাধীনতার ডাক

জাহানারা জানি

শোনো সবাই একদেশে এক সোনার ছেলের কথা,
সেই ছেলেটি এনেছিল জাতির স্বাধীনতা।
সেই ছেলেটি কেমন ছিল বলব সবার কাছে
লক্ষীবাবু তোমরা সবাই বসো আমার পাশে।
মধুমতি নদীর তীরে সুন্দর ছিমছাম,
ছায়ায় ঢাকা মায়ায় ঘেরা টুঙ্গিপাড়া গ্রাম।
সেই গ্রামে এক সোনার ছেলে করত দেশের গান
সেই ছেলেটির নামটি ছিল মুজিবুর রহমান।
মানিক রতন দেশটা আহা, মাটি সোনার দানা
তারি লোভে ভিনদেশিরা শুধুই দিত হানা
লুটতরাজের দৈত্য রাজা পেতে কালো আসন
গায়ের জোরে করত তারা এ দেশটারে শাসন
তারপর এই দস্যুগুলো করল কী যে কাম
মুছে দিতে চাইল তারা বাংলা ভাষার নাম
এসব কথার জবাব দিতে শহিদ হলো যাঁরা,
তাঁদের দুঃখে মুজিব বুকে রক্তে দিল চাড়া,
সেই ছেলেটি গর্জে উঠে দিল ভীষণ হাঁক,
সেই হাঁকেতে ছড়িয়ে গেল স্বাধীনতার ডাক।

ওয়াফা মুনসাদ, প্রথম শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল, ঢাকা

জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও মুক্তিযুদ্ধ

রিফাত নাহার দিশা

ঢাকার অদূরে সাভার স্মৃতিসৌধে যখন এসে পৌঁছালাম তখন গোধূলী লগ্ন , সূর্য পশ্চিম আকাশে অনেকটা অলস হয়ে হেলে পড়েছে। মানুষের কলরব আর ফেরিওয়ালাদের ডাকে পুরো এলাকা সরব। আমড়াওয়ালাকে দেখে মামাকে বললাম আমড়া কিনে দিতে। আমরা খেতে খেতেই দেখলাম সম্পূর্ণ স্মৃতিসৌধটি।

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আগ্রহ অন্যদের চেয়ে আমার বরাবরই একটু বেশি, কারণ আমার নানাভাই ছিলেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। ছোটোবেলায় নানাভাইয়ের কাছে যুদ্ধের অনেক গল্প শুনতাম, কিন্তু বুঝতাম না। নানাভাইকে বলতাম যুদ্ধ তো আমিও করতে পারব। তার আগে আমাকে বন্দুক চালানো শিখাও।

আজ বিজয়ের মাস, মুক্তিযুদ্ধের মাস এলেই মনে পড়ে নানাভাইয়ের সে সব অস্পষ্ট কথাগুলো, কানে ভাসে সেই বীরত্বের গাঁথা কথাগুলো, চোখে ভাসে নানাভাইয়ের হাস্যোজ্জ্বল-উৎফুল্ল চেহারাটা। সে কথা পড়ে বলা যাবে, আগে স্মৃতিসৌধ সম্পর্কে বলি। ঢাকার অদূরে সাভারে আমাদের জাতীয় স্মৃতিসৌধ তৈরি। এই বিষয়ে রচনা মুখস্থ করেছি, তবে সামনে থেকে কখনো দেখিনি। এইবার এটি সামনে থেকে দেখার সুযোগ হয়ে উঠল।

লাল ইটের দেয়াল দিয়ে ঘেরা চারিদিক, আশেপাশে শুধু মানুষ আর মানুষ, তার মাঝে নিজের গৌরবের তাজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জাতীয়

স্মৃতিসৌধ। দেখলেই মনে হয় কত না অহংকার তার। অহংকার তো থাকবেই, মুক্তিযুদ্ধের সেই গৌরবময় সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি এটি।

স্মৃতিসৌধ তৈরির জন্য অনেকে অনেক নকশা তৈরি করেন। তবে ৫৭টি সেরা নকশার মধ্য থেকে স্থপতি সৈয়দ মইনুল হোসেনের নকশাকে নির্বাচন করা হয়। ১৯৮২ সালের কিছুদিন পর স্মৃতিসৌধের মূল কাঠামো, কৃত্রিম লেক ও উদ্যানের কাজ সমাপ্ত হয়।

গৌরবের মূল কাঠামো সাত জোড়া ত্রিভূজাকৃতির দেয়াল নিয়ে গঠিত। দেয়ালগুলো ছোটো থেকে বড়ো এইক্রমে সাজানো আছে। মাঝখানের দেয়ালটি সবচেয়ে ছোটো দৈর্ঘ্যে, কিন্তু উচ্চতায় সবচেয়ে বড়ো। সর্বোচ্চ বিন্দুতে সৌধটি ১৫০ ফুট উঁচু। এই সাত জোড়া দেয়াল স্বাধীনতার আন্দোলনের সাতটি প্রধান পর্যায়কে নির্দেশ করে। ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৫৬'র শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ১৯৬৬'র ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ।

পুরো কমপ্লেক্সে রয়েছে কৃত্রিম জলাশয়, বাগান ও গণকবর। বাংলাদেশের সাতটি জাতীয় আন্দোলনের সূত্রে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। তাই এরই প্রতীক হিসেবে সাতটি দেয়াল তৈরি করা হয়েছে। এর চত্বরের লাল ইট আমাদের রক্তাক্ত সংগ্রামের প্রতীক। সামনের জলাশয় সেই সময়ের লক্ষ মায়ের, বোনের, মুক্তিযোদ্ধার অশ্রুর প্রতীক। ভিতরে গণকবর থাকায় প্রত্যক্ষভাবে শহিদদের উপস্থিতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এর সবুজ বেষ্টনী আমাদের শ্যামল বাংলার প্রতীক। স্মৃতিস্তম্ভে পৌঁছাবার জন্য উঁচুনীচু সিঁড়ি ও পথ দেওয়া আছে যা আমাদের স্বাধীনতার চড়াই উৎরাই-এর পথকে নির্দেশ করে। এভাবে একেকটি স্তম্ভ সৃষ্টি করে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধকে আমাদের মধ্যে জীবিত রাখা হয়েছে।

জাতীয় স্মৃতিসৌধ দর্শন করে আমার মনে এ দেশের প্রতি ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। আমি আমাদের দেশের এরকম শিক্ষনীয় ও স্মরণীয় স্থানে আরো বেশি ভ্রমণ করতে চাই। যাতে এ দেশকে আরো ভালোবাসতে পারি এবং দেশের জন্য কিছু করতে পারি।

নবম শ্রেণি, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক স্কুল

স্বাধীনতা

ওয়াসেক ফয়সাল

যাঁদের জন্য পেলাম মোরা
লাল-সবুজের বাংলাদেশ।
তাঁদের আত্মত্যাগের কথা
হবে না কোনোদিন নিঃশেষ।

জানাই তাঁদের হাজারো সালাম
স্মরণ করি অবদান।
মরেও আজ অমর তাঁরা
তারা আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তান।

অষ্টম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।

মায়ের চিঠি

সৈয়দ মুয়িদুল ইসলাম আর্নিব

ছেলের কাছে মায়ের চিঠি,
বাদামি খামে করে।
কি ছিল সেই চিরকুটেতে,
বলছি শুনো পড়ে।
শীতের কাল এল বাবা,
এবার বাড়ি আয়।
প্রতিবারই আসবি বলে,
রাখিস যে আশায়।
তোর আদরের ছোট্ট বোনও,
আমায় শুধু বলে।
আসবি কবে এ প্রশ্নেই,
ভরায় কোলাহলে।
এবার যেন হয় না দেরি,
কথা দে আমায়।
ভাবনায় মোর আঁখি দুটি,
পথের দিকে চায়।

দশম শ্রেণি, কালিহাতা এম আলিম মাদ্রাসা, কালিহাতা, উজিরপুর, বরিশাল।

যুদ্ধ জেতা দেশে

সালেম সুলেরী

আমরা যারা আগামীকাল নতুন গানের গায়ক,
হাতের মুঠোয় আগামী দিন, বিদ্যাপাড়ার নায়ক
ধ্যানের খুঁটি শক্ত করে জ্ঞানের পতাকাটা
হৃৎ-লাঠিতে উড়িয়ে দিয়ে সামনে দেব হাঁটা।

পথে পথে প্রযুক্তি যান, বিজ্ঞানতার ঢল,
যন্ত্র হওয়ার যন্ত্রণা নয়, থাকব অবিচল-
পুকুর ঘাটের হাঁসের পাশে মাছের প্রতিবেশী
প্রকৃতিকে বিদায় দিলে মনের ক্ষতি বেশি।

আমরা ভীষণ মন-মানবিক, কৃষিজলের দেহ
ফুল-পাখি-গান-নৌকা-শীষে রাখিনি সন্দেহ,
সেতার আছে সাঁতার আছে, মাঠের মাঝে দল
জয়ের পরে মুখের হাসি, মা-বাবা উজ্জ্বল।

গর্বে উঁচু সমাজ-স্বদেশ, ধন্য জীবন বাঁধতে
বিদেশ গেলে হে সংসারী, চোখ দিও না কাঁদতে...
দাও প্রেরণা হৃদয় খুলে, জাগাও আশীর্বাদ
বিশ্বজুকে গড়তে হবে বুক উঁচু সংবাদ।

আমরা যারা প্রজন্মমুখ, নতুন জেনারেশন
অধ্যায়নে অধিক ধ্যানে পার করি নীল সেশন।
পার হয়ে যায়– দশক দশক যুদ্ধ জেতা দেশে,
স্বাধীনতার সাফল্য স্বাদ উঠবে কি আর হেসে?

আমরা আছি জেগে ওঠার নতুন মশালধারী,
আমরা জাতির আগামীকাল, অনুজ সংসারী।
স্বাধীনতার পতাকা দৌড়, থাকবে গতিশীল
থাকবে না আর ঘাতক-চাতক ধূর্ত ঈগল-চিল।

বলছি অনেক কথা

মাহবুব লাভলু

ওমা-সেদিন-অন্ধকারে বন্ধ ঘরে
যায় না কিছু দেখা
তবু একা জানলা খুলে
জড়তা আর ভয়কে ভুলে
ইশারাতে চাঁদের সাথে
বলি অনেক কথা।

ও-চাঁদ তুমি আকাশ বুকে
কার কোলেতে থাকো
আলোয় ভুবন ভরিয়ে বুঝি
কষ্ট বুকে রাখো।
তার'চে ভালো আকাশ ছেড়ে
আমার কোলে ওঠ বেড়ে।

স্বাধীনতা

নুরুল ইসলাম বাবুল

স্বাধীনতা স্বাধীনতা
শব্দটা বেশ মধুর,
স্বাধীনতার জন্যে গেছে
সিঁথির সিঁদুর বধূর।

স্বাধীনতা আনতে গিয়ে
রক্ত গেছে বুকের,
স্বাধীনতা শব্দটা তাই
নয়ত কথা মুখের।

স্বাধীনতার জন্যে গেছে
লক্ষী ছেলে ফুপুর,
স্বাধীনতা শব্দ মানে
রক্ত ঝরা দুপুর।

স্বাধীনতা এখন আমার
ঝলমলানো আকাশ,
সাঁঝ- রাঙানো অপূর্ব রূপ
যেদিক পানে তাকাস।

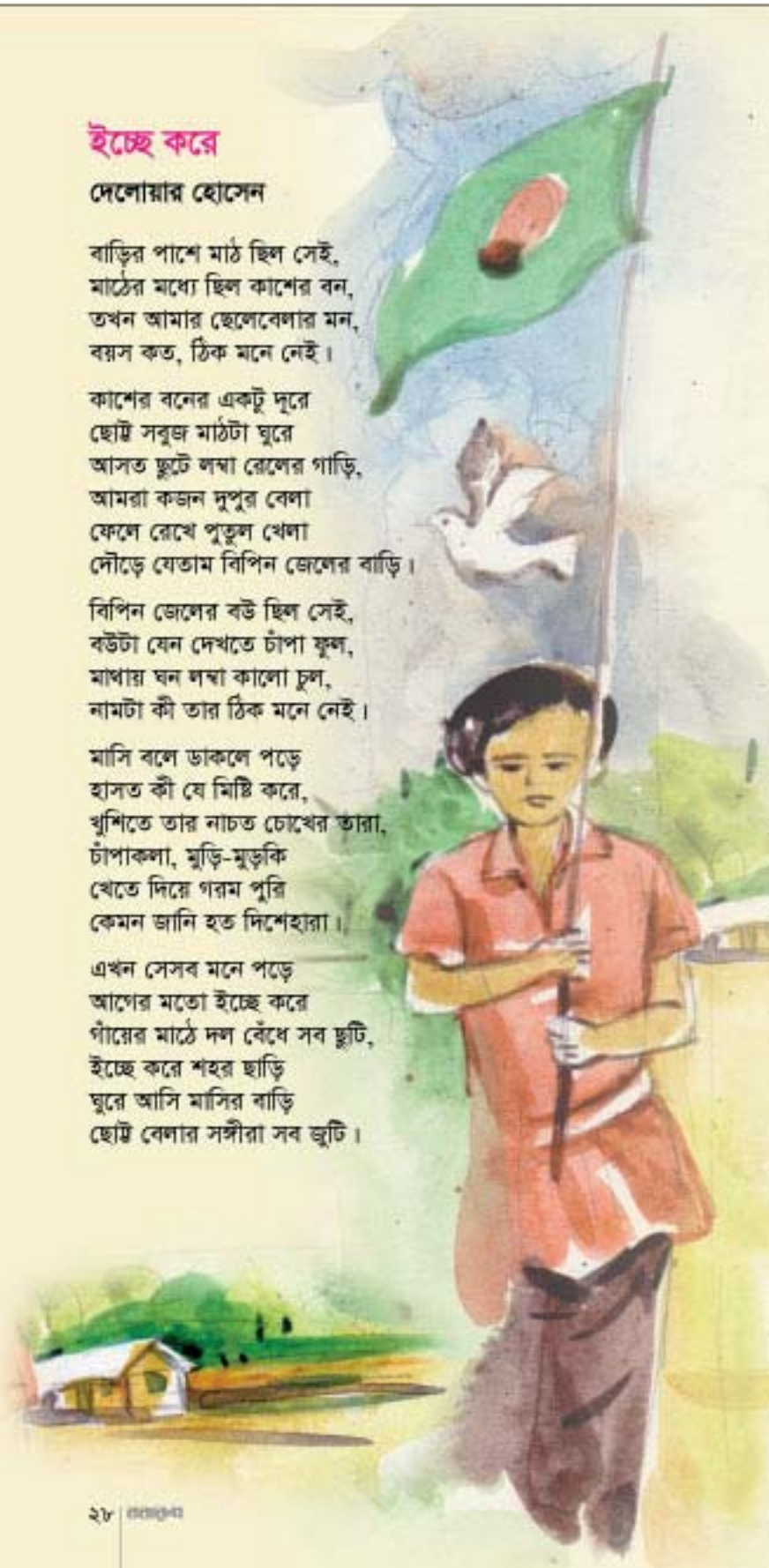

ইচ্ছে করে

দেলোয়ার হোসেন

বাড়ির পাশে মাঠ ছিল সেই,
মাঠের মধ্যে ছিল কাশের বন,
তখন আমার ছেলেবেলার মন,
বয়স কত, ঠিক মনে নেই।

কাশের বনের একটু দূরে
ছোট্ট সবুজ মাঠটা ঘুরে
আসত ছুটে লম্বা রেলের গাড়ি,
আমরা কজন দুপুর বেলা
ফেলে রেখে পুতুল খেলা
দৌড়ে যেতাম বিপিন জেলের বাড়ি।

বিপিন জেলের বউ ছিল সেই,
বউটা যেন দেখতে চাঁপা ফুল,
মাথায় ঘন লম্বা কালো চুল,
নামটা কী তার ঠিক মনে নেই।

মাসি বলে ডাকলে পড়ে
হাসত কী যে মিষ্টি করে,
খুশিতে তার নাচত চোখের তারা,
চাঁপাকলা, মুড়ি-মুড়কি
খেতে দিয়ে গরম পুরি
কেমন জানি হত দিশেহারা।

এখন সেসব মনে পড়ে
আগের মতো ইচ্ছে করে
গাঁয়ের মাঠে দল বেঁধে সব ছুটি,
ইচ্ছে করে শহর ছাড়ি
ঘুরে আসি মাসির বাড়ি
ছোট্ট বেলার সঙ্গীরা সব জুটি।

বুকের রক্তে কেনা

ফখরুল ইসলাম কল্প

সেই পাখিটা বন্দি ছিল
রুখার তাকে ফন্দি ছিল
খাঁচার ভেতর, শেকল ঘেরা
নিয়ম মানা চলাফেরা
পছন্দ তো ছিল না তার
যায় কি বাঁচা এমন তরো
ভাবল পাখি, জাগল পাখি
জেগেই পেল সে মন্তরও
বাঁচতে হলে লড়তে হবে
নয় এ খাঁচায় মরতে হবে
লড়ল পাখি, লড়ে লড়ে
বুকের রক্তে নিল গড়ে
মহা বিজয়, আনল ছিনে
মুক্ত জীবন শেকল বিনে
অবাক দুচোখ সজাগ করে
ইতিহাসও দেখে নিল
লেখে নিল লাল অক্ষরে
অভূতপূর্ব আজব কথা
বুকের তাজা রক্তে কেনা
এই পাখিটার 'স্বাধীনতা'।

দেশটা সবাই গড়ি

ফারুক হাসান

বাংলা আমার জন্মভূমি
বাংলা আমার দেশ,
এই দেশেতে জন্ম নিয়ে
গর্ব করি বেশ।

দু'চোখেতে স্বপ্ন দেখি
পল্লি মায়ের কোল
পাখপাখালির গানে গানে
মনে লাগে দোল।

হাতের পরে হাতটি রেখে
আজকে শপথ করি,
ফুল-ফসলে ভরিয়ে দেব
দেশটা সবাই গড়ি।

ছবির হাটে

নাসিরুদ্দীন তুসী

হাঁটতে গিয়ে সবুজ মাঠে
এলাম যেন ছবির হাটে
এত সবুজ এত শ্যামল
এত মধুর এত কোমল
অমল, ধবল হাওয়া–
এমন মধুর মায়ার ছবি
যায় কি কোথাও পাওয়া?

ঘুরতে এলাম নদীর কাছে
ঢেউয়ের তালে নৌকা নাচে
এ যেন এক আঁকা ছবি
এঁকেছে কোন তুলির কবি
হৃদয় রঙে ছাওয়া–
এমন মধুর মায়ার ছবি
যায় কি কোথাও পাওয়া?

চাঁদের পাশে দূর আকাশে
সাদা মেঘের পরি হাসে
কী অপরূপ মিষ্টি হাসি
বাজল যেন মোহন বাঁশি
অচিন সুরে গাওয়া–
এমন মধুর মায়ার ছবি
যায় কি কোথাও পাওয়া?

নদীর কূলে–শ্যামল মাঠে
মন হারালো ছবির হাটে
এই ছবিটা দেখতে গিয়ে
ছবির মাঝেই যাই হারিয়ে
স্বপ্নে মেলি পাখা,
ছবির মতো দেশটা আমার
সাতটি রঙে আঁকা।

কৃষ্ণচূড়া

রওশন মতিন

কৃষ্ণচূড়া এখন যেন
লাল মোরগের ঝুটি,
মাতাল হাওয়ায় গা এলিয়ে
হেসেই লুটোপুটি।

কৃষ্ণচূড়ার ডালে এখন
হাজার তারার মেলা,
সাত-সকালে সূর্য ওঠা
আগুন রঙের খেলা।

বোবার মতো নিঝুম দুপুর,
ফন্দি আঁটে কাক,
ঘুম ভেঙে যায় খোকা-খুকুর
কৃষ্ণচূড়ার ডাক।

ডাক দিয়ে যায় বনের পাখি
মাতাল হাওয়ার গান,
কৃষ্ণচূড়ার বুক জুড়ে আজ
রক্তরাঙা বান।

ফুলের ফাগুন

সাঈদ সাহেদুল ইসলাম

আজ ফাগুনে ফুল বাগানে
ফুল হাসে রে ফিক,
মন মাতে যে, দিনরাতে যে
রই পাশে তার ঠিক।

মাঠের পরে যায় যে ভরে
ফাল্গুনী–সুবাস,
তাই উঠিয়ে আয় ছুটিয়ে
মন যেন উদাস।

আয় না খুকু, আয় না দুখু
দুঃখ ভুলে সব,
হৃদয় খুলে দেখব ফুলের
আনন্দ উৎসব।

ফুলের কলি দেখেই অলি
গুনগুনে গায় গান,
ফুল বাগানেই চল ফাগুনে
সতেজ করি প্রাণ।

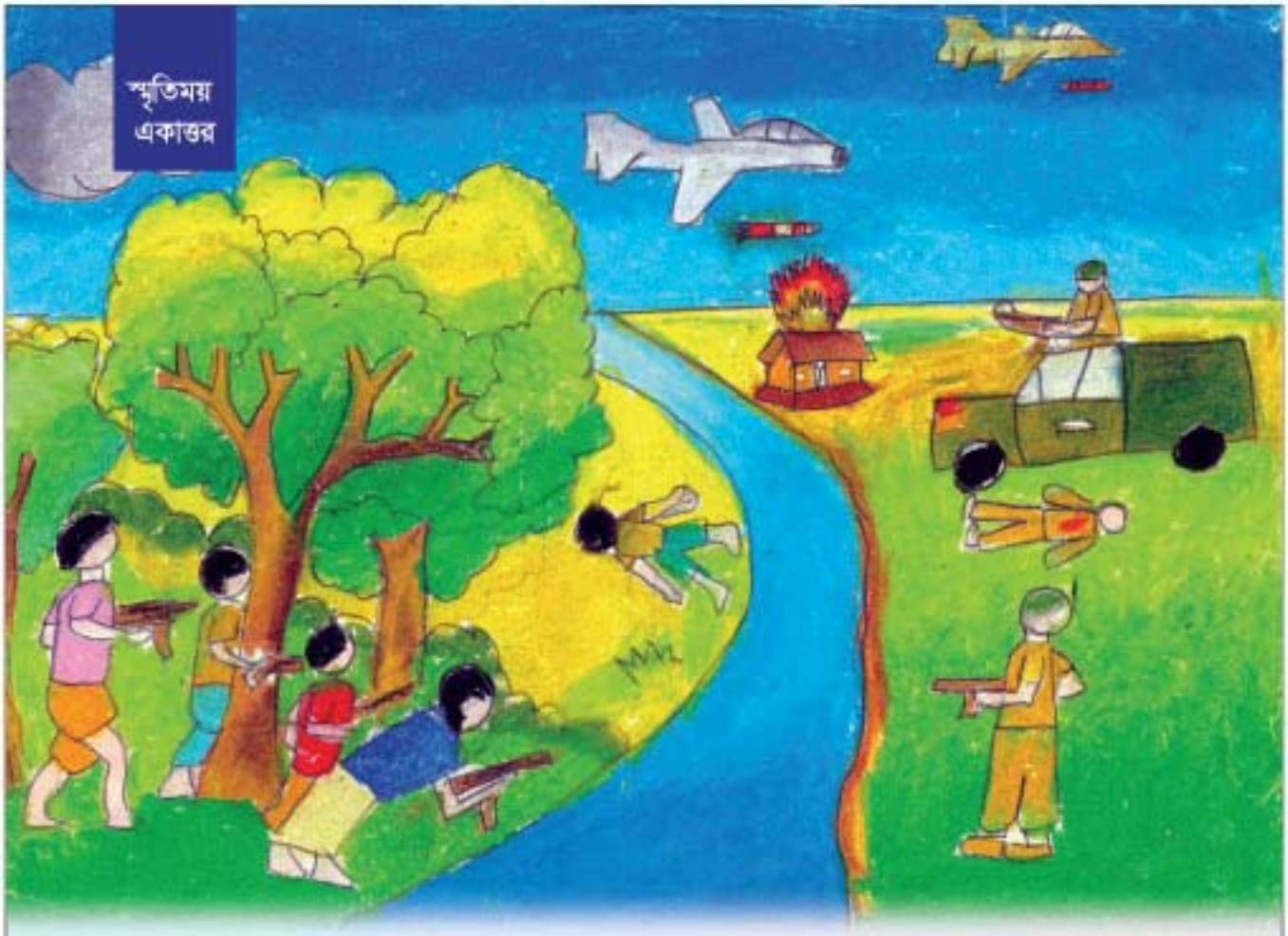

মো. সিনদিদ হোসেন, অষ্টম শ্রেণি, ফয়জুর রহমান আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

ভয়ংকর রাত

হাফিজ উদ্দীন আহমদ

কতদিন হয় একসাথে খাই না। একটু আগে আসতে পারো না বাবা !

মনে আছে একাত্তরের ২৫ মার্চে মায়ের অনুযোগ। আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইউরোলজি বিভাগের ব্যস্ত ক্লিনিকাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। রাত আটটায় প্রফেসর রাউন্ডে আসেন। তিনি নির্দেশ দিয়ে যান– ড্রেসিং করা, সেলাই কাটা, ব্লাডার ওয়াশ দেওয়া, ছোটো-খাটো অস্ত্রোপচার করা, নতুন ভর্তি হওয়া রোগীদের ম্যানেজ করা, হিস্ট্রি লেখা ইত্যাদি সকল কাজ করতে করতে প্রায়ই রাত একটা বেজে যায়। তার আগে বাসায় ফিরতে পারি না।

কিন্তু সেদিন আমি মায়ের কাছে দেওয়া কথা রাখতে তাড়াতাড়িই মানে রাত দশটায় আমাদের বাসা ৯/এ, আজিমপুর কলোনিতে ফিরলাম। আমারো তো ইচ্ছা হয় মার সাথে খেতে। আব্বা-আম্মার মাঝখানে বসে ভাইবোনদের সাথে নিয়ে একসাথে খাওয়ার সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত রয়েছি অনেকদিন।

কিন্তু হায়, এসে দেখি আমার ভাই বিএসসি ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর শেষ বর্ষের ছাত্র জুয়েল ইতোমধ্যে রাতের খাবার খেয়ে হোস্টেলে চলে গেছে। ক্ষুধা লাগায় আব্বা-আম্মাও তার সাথে খেয়ে ফেলেছেন। স্বাভাবিকভাবে ভাই বাসায় থাকে কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষার জন্য এ কদিন ইস্ট পাকিস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির হোস্টেলে বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে পড়তে যায়।

পাশের বিল্ডিংয়ের তিন তলার এক চাচা অসহযোগে অফিস বন্ধ থাকায় তার বাড়ি সিলেট চলে গেছেন। তিনি আব্বার বন্ধু। একাউন্টেন্ট। আব্বার নির্দেশে একটা বাচ্চা চাকর ছেলে নিয়ে ঐ বাড়িতে ঘুমাতে গেলাম, তাতে খালি ঘরটির দেখাশোনা হবে। ছেলেটি বিছানায় যেতে না যেতেই নাক ডাকতে শুরু করল। আমার একটু ঘুম ঘুম ভাব এসেছিল।

বুম ! বুম !

হঠাৎ গগনবিদারী আওয়াজে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। চারদিকে ভারি গোলাগুলির শব্দ। সেই সাথে অদূরে প্রায় আকাশ ছোঁয়া আগুনের শিখা।

দিনকাল কেমন যেন বদলে গেছে ইদানীং। সবখানে মিছিলের পর মিছিল। কয়েকদিন আগে ঢাকা মেডিকেলের সব শিক্ষক, চিকিৎসক মিলে শহিদ মিনারে বা বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে কালো পতাকা হাতে আমাদের অধিকার আদায়ের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের শপথ নিয়েছি। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, বাঙালিদের এ আত্মত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে অবাঙালি অথচ জনপ্রিয় ও ডাকসাইটে মেডিসিনের প্রফেসর এবং আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব ডা. এসএম রবও ছিলেন এ সমাবেশে। উল্লেখ্য সারা পাকিস্তানে তিনিই প্রথম বিলাতের এমআরসিপি পরীক্ষার পরীক্ষক হবার গৌরব অর্জন করেন।

অসহযোগ আর স্বাধিকার এর উদ্দীপনা সর্বত্র। গতকাল মেডিকেল কলেজের দেয়ালে একটি লিখনে চোখ আটকে গেছে—

জিন্না মিয়ার পাকিস্তান

আজিমপুরের গোরস্তান

কিন্তু গত রাতে কী ঘটেছে বুঝতে পারছি না। সাত সকালেই হাসপাতালে যেতে তৈরি হলাম। আব্বা মানা করলেন। কিন্তু আমি শুনলাম না। জানি হাসপাতালে গেলেই কাল রাতে কোথায় কী গোলাগুলি হয়েছে জানতে পারব, কেননা চিকিৎসা নিতে আহত লোকরা তো ঢাকা মেডিকেলেই আসবে। তাদের কাছ থেকেই জানা যাবে।

বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে খোলা মাঠটা পার হয়ে পিচঢালা রাস্তা অতিক্রম করার চেষ্টা করতেই দুটো লোক আমার সামনে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল। মাইনের আঘাতে চলে পড়েছে। সরকারি আবাস আজিমপুর কলোনি থেকে কেউ যাতে বের হতে না পারে এ জন্যই হয়ত হানাদার সৈন্যরা রাতে মাইন পুঁতে রেখেছে।

আমি সভয়ে বাসায় ফেরত এসে দেখি আব্বা রেডিওর খবর শুনতে পাগলের মতো নব ঘুরাচ্ছেন। একটু পরেই যন্ত্রটা সরব হয়ে উঠল। ঘোষকের কণ্ঠস্বর ফুরাতেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এর গলা ভেসে আসলো ইংরেজিতে :

মাই ডিয়ার কান্ট্রি ম্যান,

তারপর যা বললেন তা বাংলায় এ রকম :

আমি শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। আমি আগেই বলেছি আমি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যে সব চেষ্টা করেছি শেখ মুজিব যাতে যুক্তিসংগত আচরণ করেন। কিন্তু তাঁর একগুঁয়েমি, কোনো ন্যায়সংগত কথাবার্তা চালাতে অস্বীকার করা কেবল একটা কথাই প্রতীয়মান করে লোকটি এবং তাঁর দল পাকিস্তানের শত্রু। ...

ভাষণ চলছে। কিন্তু আর শোনার ইচ্ছা নেই। মেজাজ চরমে উঠেছে।

বাইরে সান্ধ্য আইন। অর্থাৎ এই সময় রাস্তায় বের হওয়া যাবে না।

২৭ মার্চ দু'ঘন্টার জন্য সান্ধ্য আইন উঠল। আমি আমার ভাই এর সন্ধানে বের হলাম। লিয়াকত হল (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী হল), ইকবাল হল, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার বিল্ডিং ঢাকা মেডিকেলের মর্গ ও রাস্তাঘাটের অগুনীত লাশ ঘেঁটে শেষে মিটফোর্ড হাসপাতালের মর্গে অসংখ্য মৃতদেহের স্তূপের নীচে তার নিষ্প্রাণ শরীর আবিষ্কার করলাম।

আব্বা স্বাস্থ্য বিভাগের সহকারী পরিচালক। তিনি ঢাকা মেডিকেলের সুপারকে বলে কয়ে একটা অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করেছিলেন। মৃতদেহটা নিয়ে যখন ঢাকা মেডিকেলে প্রিন্সিপাল রুমে অপেক্ষারত আব্বার কাছে ফিরলাম দেখি তাঁর দুচোখ দিয়ে নীরব অশ্রুর ঢল নেমেছে। রুম থেকে বের হতেই মেডিকেলের দেয়ালে আবার চোখ পড়ল। দেখি দুদিন আগের দেয়াল লিখন বদলে গেছে। এখন তাতে লেখা:

জিন্না শালার পাকিস্তান

আজিমপুরের গোরস্তান।

মুক্তিযোদ্ধা মুকুল ও নমিতা যেভাবে জীবন দিলেন

আখতার জাহান মালিক

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। কৃষক, মাঝি-মাল্লা, ছাত্র, শিক্ষক, চাকরিজীবী যে যেখান থেকে পেরেছেন যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন, সেদিন সমগ্র বাংলাদেশ এক হয়ে গিয়েছিল। এক মন, এক লক্ষ্য ছিল সবার । দলমত নির্বিশেষে সবাই একই উদ্দেশে একত্রিত হয়েছিল। যুদ্ধ করেছিল দেশকে বাঁচানোর জন্য। যোদ্ধারা যুদ্ধ করেছে। আহত হয়েছে লাখ লাখ মুক্তিযোদ্ধা। তাঁদের চিকিৎসা চলেছে গোপনে, আবার কখনো ভারতে, এখানে জটিল রোগীদের চিকিৎসা যখন সম্ভব নয় তখন তাদের ভারতে পাঠানো হতো।

মুক্তিযুদ্ধে গুরুতর আহত নজরুল ইসলাম মুকুল ও নমিতা রানী। তাদের চিকিৎসার জন্য ভারত পাঠানো জরুরি হয়ে পড়েছিল। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে কেউ কেউ শরণার্থী হয়ে কয়েকটি নৌকায় করে রওয়ানা হলেন ভারতের উদ্দেশ্যে। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আহত। এরমধ্যে গুরুতর আহত ছিলেন নজরুল ইসলাম মুকুল ও নমিতা রানী।

ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া সব কটি নৌকা চলছে সুন্দরবন ঘেঁষে। সুন্দরবন এলাকা দিয়েই দক্ষিণাঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের ভারতে যাওয়ার নৌপথ। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ ভারত যাওয়া-আসা করে এভাবেই। প্রতিদিনের মতো ভারতে যাওয়ার যাত্রীরা নৌকায় রওয়ানা হলেন। সুন্দরবনের ধার

শিল্পী বিন্নাতে শাহীন, চতুর্থ শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

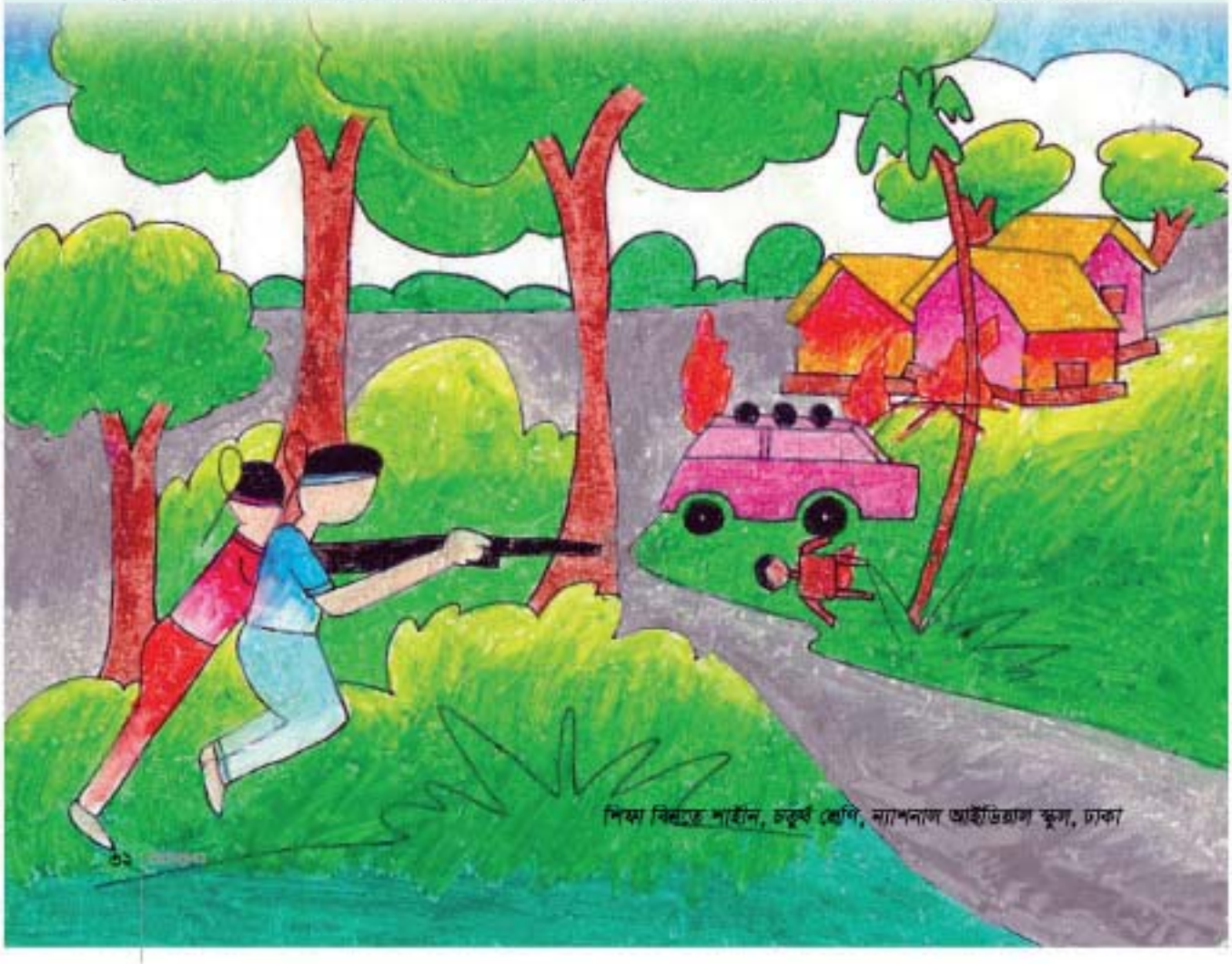

ঘেঁষে নৌকা যাচ্ছে। হঠাৎ করে দেখা গেল আর্মির গানবোট নৌকাগুলো লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে। নৌকার যাত্রীরা মাঝিকে নৌকা ভেড়াতে বলল। মাঝিরা তাড়াতাড়ি করে সুন্দরবনে নৌকা ভিড়িয়ে দিল। নৌকার যাত্রীরা যে-যার মতো নিজেকে বাঁচানোর জন্য সুন্দরবনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সবাই যে-যার মতো করে লুকাতে পাড়লেও নজরুল ইসলাম মুকুল ও নমিতা রানী সবার সাথে সুন্দরবনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারলেন না। কারণ তারা ছিলেন গুরুতর আহত। সবাই চলে গেলেও তারা পড়ে রইলেন সুন্দরবনে ঢোকার পথেই।

তারা ছিলেন গুরুতর অসুস্থ। কিন্তু গুরুতর অসুস্থ সোহরাব নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পেরেছিল। এরই মধ্যে আর্মিরা সুন্দরবনে যেখানে মুক্তিযোদ্ধারা নেমেছে সেখানে পৌছালো। ততক্ষণে যে-যার মতো সরে পড়েছে। পাক আর্মিরা সামনে পেল নজরুল ইসলাম মুকুল ও নমিতা রানীকে। তাদের পা ভাঙা দেখে বুঝতে পারল এরা দুজনই মুক্তিযোদ্ধা। আর্মিরা নমিতা ও মুকুলকে আটক করল। তারা মুক্তিযোদ্ধা নমিতাকে ব্রাশফায়ার করেছিল, এই ব্রাশফায়ারে নমিতার সারা শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। তার শরীরের এমন কোনো জায়গা ছিল না যে গুলি লাগেনি। নমিতার নিস্প্রাণ দেহ সেখানেই পড়েছিল ।

নমিতার আর ভারত গিয়ে চিকিৎসা করা হলো না। দেশের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে যিনি আহত হয়েছিলেন, চিকিৎসা করে ফিরে এসে তিনি দেশের জন্য আরো কাজ করতে পারতেন। তার সেই আসা আর পূরণ হয়নি। আর্মিদের হাতে ধরা পড়ে তার মৃত্যু হলো, যার মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিলেন একমাত্র আমাদের দেশের রাজাকার বাহিনী , তারা না হলে আমাদের দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের চিহ্নিত করা কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না।

বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গোপালচন্দ্র সাহার মেয়ে নমিতা রানী যুদ্ধ করতে গিয়ে আহত হয়েছিলেন। দেশের জন্য তিনি জীবন দিলেন। তার এই ত্যাগ জাতি কোনোদিন ভুলবে না।

নমিতাকে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করার পরে তারা নমিতার মৃত্যু নিশ্চিত করে মুকুলকে স্পিডবোটে উঠিয়ে নিল। সুন্দরবনের একটি চরে নিয়ে মুকুলকে নামালো ওরা। মুক্তিযোদ্ধা হওয়াতে তার প্রতিশোধ নিতে তারা মুকুলকে আহত করে বসিয়ে রেখে তারপর তারা স্পিডবোর্ট চালিয়ে চলে গেল গানবোটের কাছে। গানবোট স্টার্ট দিয়ে সামান্য দূরে গিয়ে তারা অবস্থান নেয়। ওরা ভাবে হয়ত মুকুলের এই অবস্থা দেখে কেউ বের হয়ে আসবে। তারা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে যায় তাদের গন্তব্যে। মুকুল পড়ে থাকে সেই চরে। জোয়ারের পানিতে এক সময় ডুবে গেল মুকুল। সঙ্গীরা যারা সাথে ছিল তারা গাছে বসে এ দৃশ্য দেখে কেঁদেছিলেন সেদিন।

মুকুল মোড়েলগঞ্জ উপজেলার মহিষকরনী গ্রামের সোহরাব খানের ছেলে। মোড়েলগঞ্জে আর্মিদের উপর হামলা চালাতে গিয়ে আহত হন তিনি।

এক তারামন

তোফায়েল তফাজ্জল

চৌদ্দের চটপটে এক তারামন
হয়েছিল যার মন ফোঁড়া টন টন;
সেই দিনই তার কাঁধে রান্নার দায়
মুক্তিরা যাতে খিদের কষ্ট না পায়।

অস্ত্র শেখাও চলে একাজের ফাঁকে,
শত্রুকে ঘায়েলের ছকও চলে আঁকে।
যেখানে যেমন খাটে ধরেও সে বেশ
পাত্তা না দিয়ে দেহে ক্লান্তি বিশেষ।
প্রয়োজনে সাঁতরায় জল পলকেই
কাঁটাগর পাড়ি দেয় এক ঝলকেই।
সম্মুখ যুদ্ধেও পুরুষের সাথে
যোগ দেয় সাহসিনী অস্ত্রাদি হাতে।

চৌদ্দের চটপটে এক তারামন
স্বাধীনতা অর্জন ছিল তার পণ।
যে কারণে ঝুঁকিতেও ছিল নির্ভয়
ছিনিয়ে আনতে এক মহান বিজয়।

রণ শেষে এল সেই কাঙ্ক্ষিত দিন,
নাচে তাই খোকাখুকি তা-ধিন তা-ধিন।

আজমেরী সুলতানা রিমু, দশম শ্রেণি, ঢাকা শিক্ষাবোর্ড ল্যাবরেটরি স্কুল, ঢাকা

পাগলু

কাজী কেয়া

বুড়িদাদির একমাত্র আপনজন পাগলু।

চারপাশে আপন বলতে আর কেউ নেই। একমাত্র ছেলে রওশন মিয়া। লোকে ডাকে রশন মিয়া বলে। জেলে, নৌকার মাছ শ্রমিকের কাজ করত। দল বেঁধে মাছ মৌসুমে নৌকা নিয়ে সাগরে চলে যেত। ফিরে আসত এক মাস-দু মাস পর। ঘরে ফিরলে ঝুড়ি ভরতি বাজার-সদাই নিয়ে আসত। কখনো কখনো পুরো মাস ঘরে বসে কাটিয়ে দিত। তখন অবশ্য, খালেবিলে হাত জাল ফেলে মাছ ধরে, সেই মাছ হাটে বেচে যা পেত , তাই দিয়ে সংসারের খোড়াক যোগাতো।

রওশনের একমাত্র ছেলে পাগলু।

পাগলুর মা পাগলু হওয়ার এক বছর না যেতেই এক রাতের জ্বরেই মারা গেল। এরপরে পাগলু দাদির কাছেই মানুষ হতে থাকে।

পাগলুর মা মরে যাওয়ায় বাবা রওশন আর ঘরমুখো হতে চায় না। এখন সে সাগরে মাছ ধরতে যায় না। সাগরপাড়ের শুঁটকি আড়তে কাজ করে। হঠাৎ আলাভোলা পাগলুর কথা মনে হলে দু'চারদিনের জন্য ঘরে ফেরে। তখন ছেলের জন্য জামাকাপড়, খেলনা, খাবার কেনে। বুড়িমায়ের জন্যও শাড়ি, পান-সুপারি এটা ওটা নেয়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর রওশন আর গ্রামে ফেরেনি।

পাগলু এখন ১২/১৩ বছরের কিশোর। কিন্তু কথা বলতে পারে না, গলায় আ..আ. শব্দ করে ইশারায় কথা বলে। কেউ তার কথা না বুঝলে রেগে যায়। হাত-পা ছোঁড়ে, লোকে এজন্য তাকে পাগলা বলে ডাকে। দাদি আদর করে ডাকে পাগলু বলে। পরে পাগলু হয়ে যায় তার কমন নাম।

পাগলুদের গ্রাম হোসেনপুরেও একদিন হুট করে পাক আর্মিরা ঢুকে পড়ে। স্কুলঘরে ক্যাম্প করেছে। তাদের সঙ্গে গ্রামের মতি চেয়ারম্যান, শাকা মেম্বারও জুটেছে। তারা রাজাকার বাহিনী গঠন করেছে। গ্রামের কিশোর, তরুণ ছেলেরা কেউ ঘরে থাকে না। অনেকে মুক্তিযুদ্ধে চলে গেছে। কেউ কেউ গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে। রাজাকার বাহিনী দশগ্রাম ঘুরে ঘুরে তরুণদের জোর করে রাজাকারে ঢোকায়।

একদিন বুড়িদাদির উঠানে একদল রাজাকার এসে হাঁক ছাড়ে, 'ওই বুড়ি, তোমার পোলা রশন মিয়া কই গেছে? তারে দেখি না কেন?'

বুড়িদাদি বেড়ার দরোজা ফাঁক করে শাকা রাজাকারকে দেখে চমকে ওঠে। বলে, 'তোমরা তো জানোই সে সাগরে মাছ ধরতে যায়। তা পেরাই ছয় মাস হইয়ে গেল এহনো তো ফিরল না।'

'শোনো বুড়ি, আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে রশন মিয়া মুক্তিতে নাম লেখাইছে। ভারতে গেছে ট্রেনিং নিতে। তোমারে কয়ে দিচ্ছি – সাতদিনের সময় দিলাম, এরমধ্যে সে সারেন্ডার না করলে তোমাগোর খবর আছে কিন্তু।' শাকা রাজাকার শাসায়।

'কী কও বাবারা! সে হচ্ছে গিয়ে সাদাসিধে একটা বউমরা দুখি মানুষ। সে কি কোনোদিন মুক্তিযোদ্ধা হতি পারে। আর যুদ্ধে যাওনের সাহস কি তার থাকতি পারে?'

'শোনো এসব বুঝি না। তোমার ওই নাত ছাওয়ালটা কই? ওরে সঙ্গে নেবো। যদ্দিন রশন মিয়া না আসে সে আমাগোর জিম্মায় থাকবে।' শাকার সঙ্গী কাছিম রাজাকার কথাটা বলেই বুড়িমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঘরে ঢোকে। পাগলু ঘরের মাটিতে বসে পানতা খাচ্ছিল। কাছিমকে এভাবে ঘরে ঢুকতে দেখে ভয়ে কুঁকড়ে যায় পাগলু।

'ওই ব্যাটা খাওন রাখ। আমাগোর সঙ্গে চল'– বলেই হাত টেনে তাকে ঘরের বাইরে নিয়ে যায়। বুড়িদাদি হা হা করে ওঠে। চিৎকার করে অনুরোধ জানায়, 'বাপধনরা আমার, ওই একটামাত্র ভরসা আমার। একমাত্র নাতছাওয়াল। তারওপর সে বোবা, কথা কইতে পারে না। পাগল-ছাগল, বোকা-হাদা ছাওয়ালভারে লয়ে তোমাদের কাজে লাগবে না। ওরে ছাইড়ে দাও বাজান। আমারে ছাড়া সে বাঁচবে না। আমিও ওরে ছাড়া বাঁচুম নারে বাপ!'
কে শোনে কার কথা। নির্দয় রাজাকাররা পাগলুকে ঠিক গরু টেনে নেওয়ার মতো নিয়ে যেতে থাকে। পাগলু দাদির দিকে তাকিয়ে থাকে ফ্যালফ্যাল করে। দাদিও মাটিতে দু'হাত চাপড়ে চাপড়ে আহাজারি করতে থাকে।

কোথায় যাবে দাদি? ছোটো এক টুকরো ভিটে। এই টুকুতেই দু'চারটা গাছ। পেয়ারা আর একটা বরই গাছ, ঘরের চাল ঘেঁষে বেড়ে উঠেছে। সামনের কাঁচা পথটা ঝোপঝাড়ের জন্য দেখা যায় না।

পাগলুকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় দাদি আহাজারি করতে করতে রাস্তা পর্যন্ত ছুটেছিল। কিন্তু তাকে পেছনে ফেলে রাজাকাররা পাগলুকে একটা ভ্যানে চড়িয়ে পশ্চিমে চলে যায়। পশ্চিমে স্কুলঘরে পাক হানাদারদের ক্যাম্প।

বেশ কিছুক্ষণ পথের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে দাদি ভিটেয় ফেরে। দিনটা উপোসে কেটেছে। রাতে হারিকেন জ্বলেনি। কাঁদতে কাঁদতে বুড়ি ঘুমিয়ে যায়।
কাকগুলো কা-কা করে ডাক শুরু করলে দাদির ঘুম ভাঙে। উঠোনে গিয়ে দাঁড়ায়। কাকগুলো তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে আরো জোরে ডাকতে থাকে।
এই কাকগুলো পাগলুর বন্ধু। এদের ডাক শুনে প্রতিদিন পাগলুর ঘুম ভাঙত। সে মাটির সরা ভরে খুদ নিয়ে তাদের সামনে ছড়িয়ে দিত। ওরা খুটেখুটে খেতো, আর আনন্দে ডাকাডাকি করত।
দু'চারটা কাক পাগলুর কাছ ঘেঁষে লেজ নাড়াতো, গায়ে গা ঘষত। পাগলু ওদের আদর করে পিঠে হাত বুলিয়ে দিত।

আজ ভোরেও কাক বন্ধুরা আসে। বুড়িদাদি উঠোনে আসতেই তারা উড়ে গিয়ে বরই ডালে, পেয়ারা গাছে, ঘরের চালে গিয়ে বসে জোরে-জোরে ডাকতে থাকে। তারা তাদের প্রিয় বন্ধু পাগলুকে ডাকছে যেন। কিন্তু পাগলু তো নেই। বুড়িদাদি কাঁদে। আচঁলে চোখ মুছে বলে, 'কাউয়ারে তোদের পাগলু ভাইরে রাজাকাররা ধইরে লইয়ে গেছে। আজ আমিই তোদের খাওয়াবো। তোরা তার জন্য দোয়া কর ভাই। ওরে যেন হেরা ছাইড়ে দেয়।'

বুড়িদাদি ঘর থেকে এক সরা খুদ এনে ছড়িয়ে দেয়। আশ্চর্য, একটা কাকও খেতে এল না।
'আয়রে কাউয়া, খা, এই তো খুদ দিছি। খা...। খাইয়ে আমার পাগলুর জন্য দোয়া কর।'
না, কাকগুলো হঠাৎ নীরব হয়ে গেল। খুদ পড়ে থাকল আঙিনায়।

দাদি আর কী করে। মনে তার অনেক কষ্ট। নাতির জন্য গলা ছেড়ে কাঁদতে চাইল। কাল কিছু পেটে পড়েনি। নাতি ছাড়া সে কিছু খায় না। ঘরে ঢুকে আবার শুয়ে পড়ল দাদি। কাকের ডাক নেই। তারা বুড়ির ভিটে ছেড়ে চলে গেছে।

বুড়ি তিন দিন ধরে ঘরে একা । পানি ছাড়া কিছুই খায় নি একদিনও। বুড়িদাদির খোঁজখবর নিতে ছুটে আসে

পাশের পাড়ার খালেক রাজাকারের বউ ফুলী বেগম। আসে চৌকিদারের বউ আমেনা বিবি।

'ও দাদি তোমার একি হলো?' ফুলী বেগম মাথায় হাত বুলায় দাদির। আমেনা বিবি শোয়া থেকে টেনে তোলে দাদিকে। সে কোচর ভরতি মুড়ি আর শক্ত ঝোলা গুড় এনেছে।

বলে, 'দাদি ওঠো , খাও।'

'নারে বোন, তোরা তো জানিস আমার পাগলুরে ছাড়া আমি খাই না। তা আমার পাগলু কেমন আছে জানিস?'

'ভালো আছে দাদি, সে ট্রেনিং নিচ্ছে।' ফুলী বেগম জানায়।

'ট্রেনিং? কিসের ট্রেনিং?'

'কেন, রাজাকারের ট্রেনিং! বন্দুক ছোড়ার ট্রেনিং।'

'কি কসরে তুই? আমার পাগলুরে ওরা রাজাকার বানাইবে?'

আমেনা বিবি দাদিকে চিমটি কেটে চুপ করিয়ে দেয়। রাজাকার খালেকের বউ ফুলী বেগম দাদির কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, 'ওরে তো এ ট্রেনিংটা দেওয়ার বুদ্ধি দিছে আমাগোর পারুলের বাপ। বুঝলে দাদি, নইলে পাক আর্মিরা ওরে মাইরা ফেলত।'

'কেন মারত?' দাদি চেঁচিয়ে ওঠে, 'সে কি কোনো দোষ করছে?'

'ওর বাপ নাকি মুক্তিযোদ্ধা। এডা খারাপ মানুষরা আর্মিদের কইছে। তাই রাজাকারে ঢুকায়ে ওরে বাঁচানোর কৌশল নিছে আমাগোর পারুলের বাপ। আর আলাভোলা মা-মরা ছাওয়ালডার মধ্যে একটা সাহস জাগানোরও তো দরকার। সে জন্যই পারুলের বাপ এই বুদ্ধিটা খাটাইছে।' কথাটা বলে দাদির কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে আরো বলে, 'বুঝলা দাদি, আমাগোর পারুলের বাপ রাজাকারের ট্রেনিং নিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সে মুক্তিযোদ্ধাগোর লোক। তোমার ছাওয়াল রশন আলীও মুক্তিযোদ্ধা। তার লগে ওর যোগাযোগ আছে। পরে সবকিছু বুঝবা...।'

'কি কইলি? আমার রশন...!' দাদির কথা শেষ

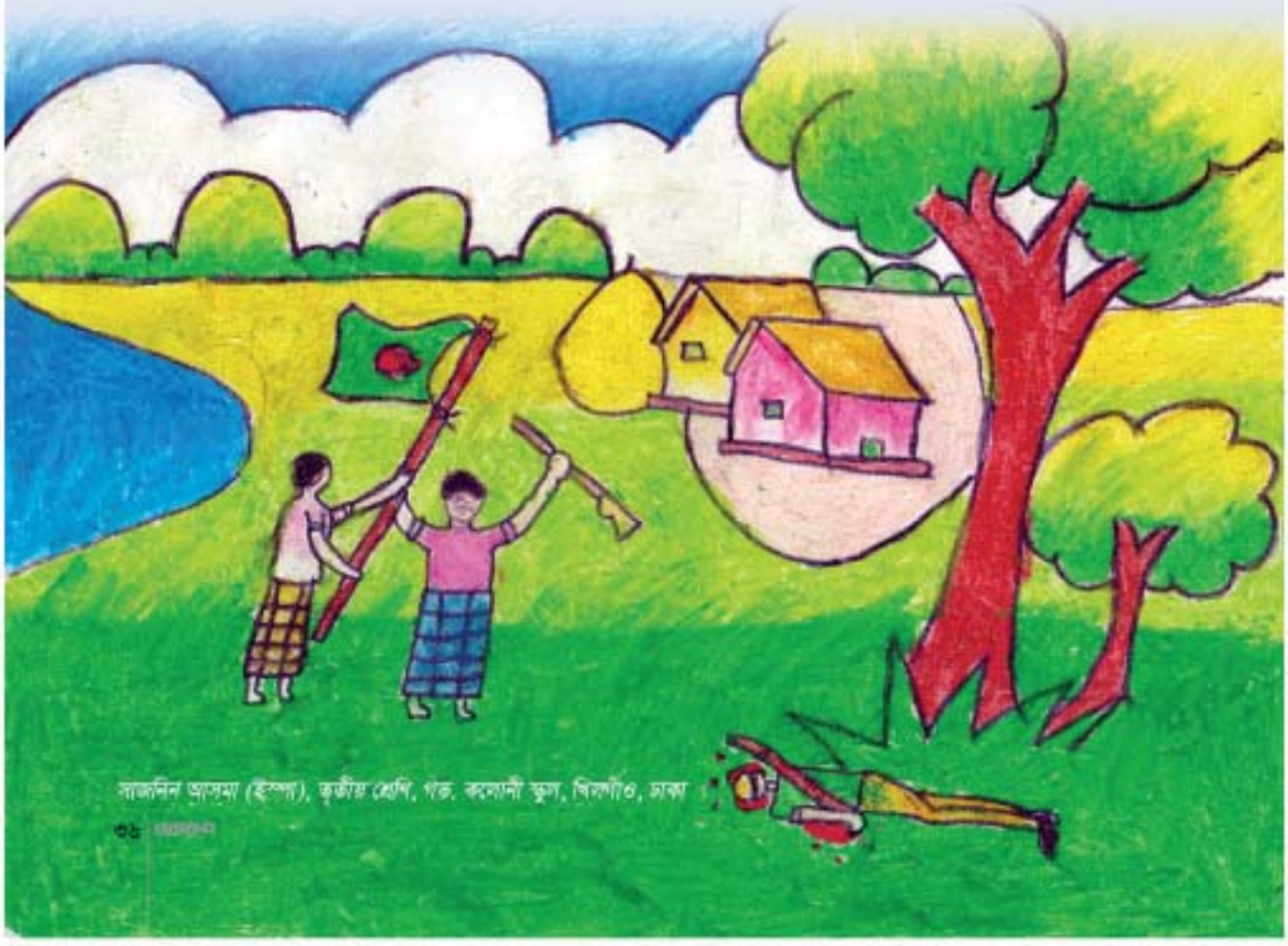

সাজনিন আসমা (হৃদ্পা), তৃতীয় শ্রেণি, গভ. কলোনী স্কুল, খিলগাঁও, ঢাকা

হওয়ার আগেই তার মুখে হাত চেপে ধরে খালেক রাজাকারের বউ– 'চুপ করো, এহন দিনকাল ভালো না। পরে সব কব।'

রাত গভীর। হঠাৎ চারদিকে গোলাগুলির প্রচণ্ড শব্দ। দাদির ঘুম আসে না। মনটা আঁতকে ওঠে। ভয়ে কুঁকড়ে যায়। আকাশ আলো-আলো হয়ে উঠছে সময়-সময়। পথে লোকজনের দৌড়াদৌড়ির শব্দ। এরমধ্যে আওয়াজ ওঠে– জয় বাংলা, জয় বাংলা...। শব্দে আকাশ-বাতাস উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। বুড়িদাদি বুঝে ফেলে একটা কিছু হয়েছে। ' আমরা কি স্বাধীন হইছি?' নিজে নিজেই প্রশ্ন করে আঁধার ভেঙে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে পথের দিকে যেতে থাকে। দেখে মানুষ শুধু ছুটছে। ছেলে-বুড়ো সবাই 'জয় বাংলা' বলতে বলতে ছুটছে।

'ওরে তোরা যাস কই? দেশ কি স্বাধীন হইছে?'

বুড়ির কথা কারো কানে যায় না। বুড়িদাদির মনটা উশখুশ করে। সে পথের পাশে বসে পড়ে।
মসজিদ থেকে ভোরের আজান ভেসে আসে। বুড়ি ভিটেয় ফিরে যায়। ফজরের নামাজ পড়ে। এক মগ পানি ঢক ঢক করে গিলে উঠে দাঁড়ায়। এবার হাতের লাঠিটা ঠুকতে ঠুকতে বের হয়। উদ্দেশ্য-স্কুলমাঠ। পাক আর্মিদের ক্যাম্প। ওদিকেই সবাই যাচ্ছে। ওই ক্যাম্প এখন মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে। ওখানে মুক্তিসেনারা জড়ো হয়েছে, পাগলুকে ওখানে পাওয়া যেতে পারে। ছেলে রশনও থাকতে পারে– সেও যে একজন মুক্তিযোদ্ধা।

হাঁটতে থাকে বুড়ি। বুড়ির পাশ কাটে শত-শত ছেলেবুড়ো। জয় বাংলা বলতে-বলতে ছুটছে।
বুড়ি হাঁটে টুকটুক, ঠকঠক লাঠি ঠুকতে ঠুকতে। বুড়ির মন খুব খুশিখুশি। বুড়ির পেছন-পেছন শতশত কাক। কাকরা ডানা মেলে ধীরগতিতে ওড়ে। বুড়ি যায় স্কুল ক্যাম্পে। কাকরা যায় কোথায়? কাক ডাকে কা-কা...।
বুড়ি জানে কাকরা যায় কোথায়। কাক যায় তার বন্ধু মুক্তিসেনা পাগলুকে দেখতে। কা-কা-কা-কা...।
কাকেরাও হয়ত তাদের ভাষায় 'জয় বাংলা জয় বাংলা' বলছে। কেউ না বুঝুক, বুড়ি বোঝে।
সূর্য যখন আলো করা ভোর হয়ে ফুটে উঠল। বুড়ি তখন ক্যাম্পের মাঠের কাছে। এ কী– কত মুক্তিসেনা! সবার কাঁধে, হাতে ছোটো ছোটো বন্দুক। কারো হাতে লাল-সবুজ, হলুদ পতাকা। বুড়ি জানে ওটা জয় বাংলার পতাকা।

হঠাৎ বুড়ি দেখে হাফ প্যান্ট, সবুজ গেঞ্জি, কোমরে গামছা বাঁধা, মাথায় বড়ো চুল, কাঁধে ছোটো রাইফেল, হাতে জয় বাংলার পতাকা– এক ছোট্ট মুক্তিসেনাকে আর একজন মুক্তিসেনা কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্য মুক্তিসেনারা হাত উঁচু করে স্লোগান দিচ্ছে– জয় বাংলা... জয় বঙ্গবন্ধু। জয়, জয়-পাগলু, জয় রশন মিয়া...।
বুড়ি সেদিকে ছুটে যায়। বাপ মুক্তিসেনা রশনের কাঁধে বসা ছোট্ট মুক্তিসেনা পাগলু দাদিকে দূর থেকে দেখেই– 'দাদি গো' বলে চেঁচিয়ে ওঠে।

দাদি অবাক। বিস্ময়-চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে– 'একি! তার বোকা-সোকা বোবা নাতছেলেটা মুক্তিসেনা? আবার তার মুখে কথাও ফুটছে? এ কেমনে হয়?'

পাগলু বাপের কাঁধ থেকে নেমে দৌড়ে যায় দাদির কাছে। পেছন পেছন বাপ রশন মিয়া। তার সঙ্গে আরো কয়েকজন মুক্তিসেনা। পাগলু গিয়ে দাদিকে জড়িয়ে ধরে।

রশন মিয়া গিয়ে মায়ের মাথায় হাত রেখে বলে, 'মা গো, আমরা এখন স্বাধীন, আর তোমার পাগলুও দেশের মুক্তিযুদ্ধে অনেক বড়ো কাজ করেছে। সে রাজাকারের ছদ্মবেশে সেরা মুক্তিযোদ্ধা। সে ককটেল ছুঁড়ে পাক আর্মিদের ছাউনি উড়াইছে, মাইন ফিট করে দশ গাড়ি রাজাকাররে শেষ করছে। ওর সাহসিকতায় হোসেনপুর আজ মুক্ত এলাকা। দেশের অনেক জায়গা এখন মুক্ত। ঢাকায় আজ পাক আর্মিরা মানে সব হানাদার শত্রু সারেন্ডার করবে। আমরা স্বাধীন হইলাম মা। আর তোমার বীর মুক্তিযোদ্ধা নাতির মুখেও খোদার ইচ্ছায় কথা ফুটছে।'

বুড়ি নাতিকে বুকে জাপটে ধরে বলল, 'কেমনে তোর মুখে কথা ফুটলো রে ভাই?'

পাগলু দাদির দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'যেদিন ককটেল ছুঁইড়া এক ডজন হানাদার খতম করি– ইচ্ছা হয় 'জয় বাংলা' কইয়া একটা চিৎকার মারি। চেষ্টা করি শব্দ বাইর হয় না। এভাবে কয়েকবার চেষ্টা করতেই– 'জয় বাংলা' গলা ছিঁইড়া ফুইটা ওঠে। তারপর আমি আর তোমার বোবা নাতি থাকলাম না দাদি!'

বুড়ির চোখে আনন্দের অশ্রু। তাদের চারপাশে শত শত কাক। তারাও আনন্দে কা-কা-কা করে বাতাস মাতিয়ে তুলল।

স্মৃতিময় একাত্তর

যুদ্ধে গেলাম কেমন করে

মিলি হক

প্রতি বছর পালিত হয় স্বাধীনতা দিবস। ২৬ মার্চ স্বাধীনতার জয়োল্লসিত প্রতিটি বাঙালির রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ দেশ আমার এ মাটি আমার। ৪৬ বছর আগে এই স্বাধীনতার মাসে যে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হয়েছিল কে জানতো সেও এই মাটির স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে। ১৯ বছর বয়েসি বাবার প্রথম সন্তান মোল্লা নজরুল ইসলাম। বাবা-মায়ের আদর ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে জন্মস্থান বাগেরহাট ত্যাগ করেন। ১৯৭১ সালের এপ্রিলে ভারতের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান তিনি। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে বুঝেছিলেন এদেশ স্বাধীন করতে হবে। কীভাবে করবে, কেমন করে করবে তা বোঝার বয়সও হয়নি। শুধু বঙ্গবন্ধু বলেছেন, যার যা আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড় শত্রুর মোকাবিলা কর।

নিজের মুখেই শোনা যাক তার যাত্রা শুরুর অভিজ্ঞতা– ট্রেনে রূপসা পৌঁছে দাকোপা, বৌঠাঘাটা, লাউঢোক, চালনার ভিতর দিয়ে পাইকগাছা, আশাশুনির পথ ধরে সঙ্গীহীন অবস্থায় পকেটে মাত্র ৩০ টাকা সম্বল করে এক কাপড়ে সাহেবখালি বর্ডার হয়ে হিঙ্গলগঞ্জ অর্থাৎ ভারত পৌঁছাই। হিঙ্গলগঞ্জ থেকে হাসনাবাদ টাকি পৌঁছাই। তখন হাসনাবাদের মহকুমা বশিরহাট। সেখানে মেজর এম. এ জলিলের সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি তখন দুই কামরাবিশিষ্ট দালান–এ থাকেন। তিনি আমাকে উনার সাথে থাকতে বলেন। তাঁর পাশেই তাবুর ছাউনি দেওয়া মুক্তিযোদ্ধাদেরও অবস্থান ছিল। সংখ্যায় আনুমানিক ৩০ জন সদস্য হবেন। আমি বশিরহাট নৈহাটি বকুলতলা ক্যাম্পে নাম লেখাই। বশিরহাট ক্যাম্পে আমার ট্রেনিং হয়। মেজর এম. এ জলিল আমাকে বলেন, রোজ বিকালে বাংলাদেশের যশোর, সাতক্ষীরা রোডের পাশে মাইন পুতে রাখতে। তাতে পাকবাহিনীর গাড়ি চলাচলের

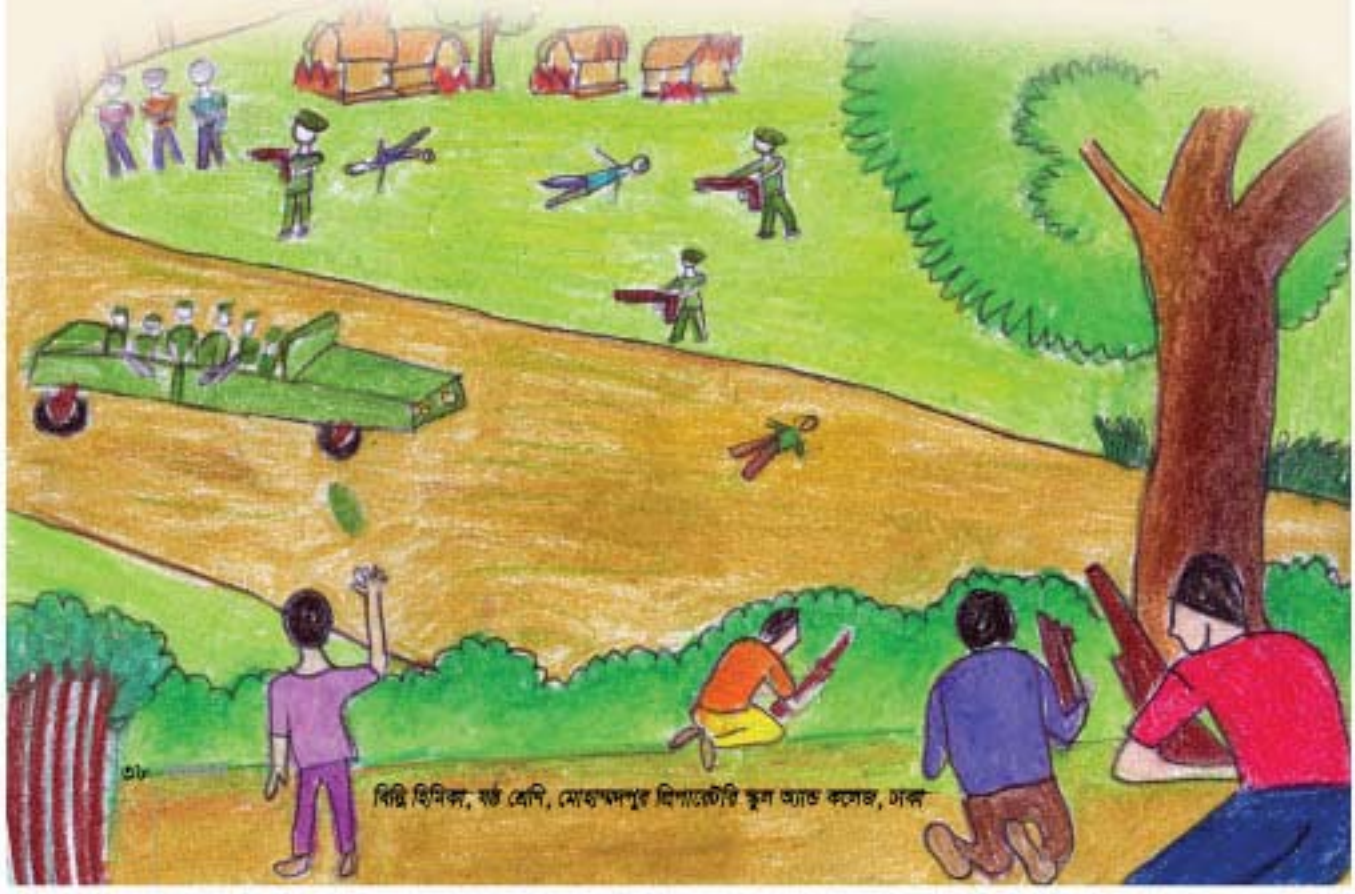

বিন্টি হিমিকা, ষষ্ঠ শ্রেণি, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

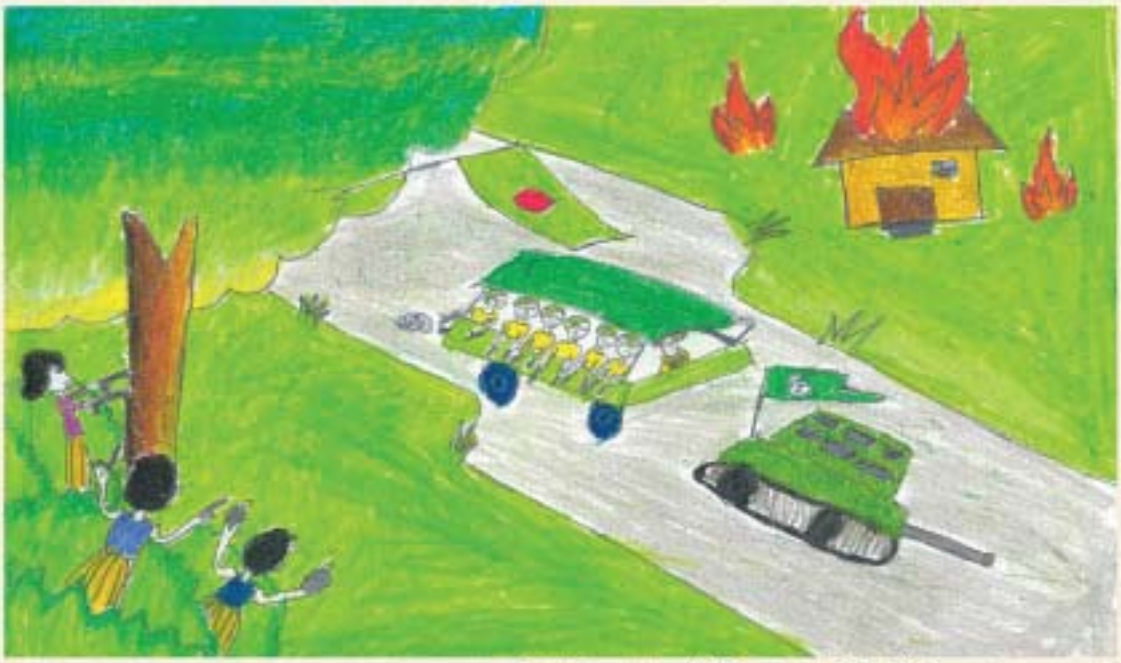

আরিবা রাইয়াত জারা, ষষ্ঠ শ্রেণি, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

সময় তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও মৃত্যুবরণ করতো। ঐ একই অঞ্চলের কাঠের ব্রিজ, সেতু উপড়ে ফেলতাম যাতে পাকসেনা বা রাজাকাররা চলাচল করতে না পারে। তাদের অন্যায় কাজকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য রাতের অন্ধকারে জীবনের মায়া ত্যাগ করে প্রতি রাতে আমাদের এই সমস্ত কাজ করতে হতো। একদিন রাতের বেলা রাজাকারদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে আমরা আমাদের ১০-১২ জন সঙ্গী বন্ধুদের হারাই। শহিদ হন তারা। অপরপক্ষে শত্রুরা বেশি হতাহত হয়। এ যুদ্ধে এসএলআর, থ্রি নট থ্রি, এসএমজি অস্ত্র ব্যবহার করি। মৃত্যুদৃশ্য দেখেও আমরা মনোবল হারাইনি। কারণ আমাদের লক্ষ্য স্বাধীনতা চাই। ফিরে গেলাম আবার আমাদের ক্যাম্পে। ক্যাম্পে চাল, ডাল ভূষির খিচুরি নিয়মিত খেতাম। সপ্তাহে ১দিন ছোটো মাছের সন্ধান মিলতো। তা ছিল তেলাপিয়া মাছ। বিকালে ১ কাপ চা ১টা রুটি। কখনো ১ পিস মাংস খেয়েছি। এসব খাবার খেয়েও হতাশ হয়নি। বাড়ির ভালো খাবারের জন্য মন কাঁদেনি, কোনো লোভ-লালসা জাগেনি। তাবুতে পিঠের নীচে বর্ষার পানির স্রোত বয়ে যেত। ঐ বছর এত বর্ষা হয়েছিল যা ইতোপূর্বে হয়নি বলে বয়স্কদের কাছে শুনেছি।

বেশ কিছুদিন পর আমলাপাড়া হাই স্কুলের টিচার দেবদাসের সঙ্গে সমদ্দারকে প্রধান করে একটা বাহিনী গঠন করি। যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে মেজর এম.এ জলিলের নির্দেশে ২ জন মিত্র বাহিনীকে সঙ্গী করে ২/৩ জন মুক্তিযোদ্ধাকে মংলাবন্দর দেখিয়ে দেওয়ার জন্য খুলনা রওনা দেই। ঐ সময় কিছুদিন চালনা অবস্থান করি। চালনা রাজাকার মুক্ত হলে খুলনা শিপইয়ার্ডে যাই। পাক বাহিনীরা শিপইয়ার্ডে রূপসা নদীর এপাড়ে ট্যাংক ফিট করে যাতে নদীতে কোনো মিত্রবাহিনী বা মুক্তিবাহিনী না যেতে পারে।

যুদ্ধের ভেতর বাবা-মায়ের জন্য মনটা যখন ব্যাকুল হয়। তখন ১০ দিনের ছুটিতে রাতের অন্ধকারে বাড়িতে আসার পর মাকে এক পলক দেখে আবার ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দেই। ফেরার সময় ফক ডাক্তারকে পাক সেনারা মেরে ফেলে। তার অল্প বয়েসি কন্যা বকুলদি, স্বামী হারা ফক ডাক্তারের স্ত্রী এবং আশপাশের সীমা, আরতি, মুক্তিযোদ্ধা মল্লিক বাড়ির মোশাররফকে নিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে কালিগঞ্জের বাঁশতলা খেয়াঘাটে পৌঁছাই। এতসব পথচলা মোটেও সহজ ছিল না। পথে পাকসেনা বা রাজাকাররা তাদের অনুসারীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে চলতে হতো। তারপরও নৌকায় পৌঁছানোর পর রাজাকাররা নৌকা থামাতে বলে। মৃত্যু অবধারিত জেনেও কৌশলে নৌকা না থামিয়ে অন্যপথ ধরি এবং হেঁটে ভারতে পৌঁছাই আরো একবার।'

বড়োদের গল্প

মা পাখিটা

হাসি ইকবাল

ডিম ফুটে ছানা বের হবার পর থেকেই দুর্বল ছানা পাখিটা । ঠিকমতো দাঁড়াতেও পারে না। অন্য দুইটা ছানা আবার বেশ শক্ত সবল । প্রতিদিন অনেক দূর থেকে মুখে করে খাবার নিয়ে আসে মা পাখিটা। শক্ত সবল ছানা দুটো বড়ো হা করে তা গিলে। কিন্তু দুর্বল ছানাটা ঠিকমতো হাও করতে পারে না। এ নিয়ে মা পাখিটার দুঃখের যেন শেষ নেই।

কোকিল নাকি পাখিদের কবিরাজ। তার সাথেও পরামর্শ নিতে নিতে কাহিল মা পাখিটা। কোকিল পরামর্শ আর চিকিৎসার জন্য মা পাখিটার কাছ থেকে সুপারি গাছের ডালে একটি খাঁচা বানিয়ে দিতে বলল। মা পাখিটা রাজি হয়ে গেল। অন্য দুইটা ছানা কিছুটা উড়তে শিখেছে। তারা কাছাকাছি গাছের ডালে, মাটির নীচে নেমে নিজেরাই পোকামাকড় ধরে খায়। কিন্তু দুর্বল পাখিটা উড়তে তো পারেই না আবার একটু নড়াচড়া করতে গেলেই পড়ে যায় এমন অবস্থা। মা পাখিটা সবসময় ভয়ে থাকে দুর্বল পাখিটাকে নিয়ে। বাইরে কোথাও খাবার আনতে গেলে বার বার দুর্বল পাখিটাকে বলে, 'বাছা আমি না আসা পর্যন্ত নড়াচড়াও করবে না।'

দুর্বল ছানাটার খাঁচায় বসে বসে থাকতে ভালো লাগে না। তার অন্য দুই ভাই বেশ দিব্যি আকাশে উড়াল দেয়। স্বাধীন মতো ঘুরে বেড়ায়। মন যা চায় তাই ধরে খায়। দিন দিন মনটা বেশি খারাপ হতে থাকে দুর্বল পাখিটার।

দেখতে দেখতে ছানাটাও বড়ো হয়ে যায়। কিন্তু উড়ানোর শক্তি তার এক্কেবারে নেই। তার অন্য দুই ভাই বাসা ছেড়ে চলে যায় এক সময়। এতদিনে তারও যাবার কথা ছিল। মা পাখি প্রতিদিন বহুদূর থেকে তৃণলতা সংগ্রহ করে পাশের একটা সুপারি গাছে কোকিলের জন্য খাঁচা তৈরি করতে থাকে। কোকিল বিনিময়ে বিভিন্ন পোকামাকড় আর লতাপাতা থেকে ঔষধ তৈরি করে দেয় ছানাটার জন্য। কিন্তু ছানা পাখিটার শরীরের খুব একটা উন্নতি হয় না। মা পাখিটা নালিশ নিয়ে যায় কোকিলের কাছে। বলে, আমি তো তোমার কথামতো তোমাকে বাড়ি তৈরি করেই দিচ্ছি। তাহলে আমার ছানার উন্নতি হচ্ছে না কেন?

কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে কোকিলের সাথে ঝগড়া লাগে মা পাখিটার। মা বাবুই পাখি আর কোকিল দুজনে লড়াই শুরু করে। সব পাখিরা এসে মনোযোগ দিয়ে শোনে। তাদের উপর বিচারের ভার দেয় মা পাখিটা। তখন কোকিল বলে, ঠিক আছে আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব।

কোকিল দিনের পর দিন গবেষণা করতে থাকে। পোকামাকড়ের পাশাপাশি বিভিন্ন লতাপাতা আর ফলমূলের নির্যাস থেকে ছানাটার জন্য ঔষধ তৈরি করে। মা পাখিটা দিনের পর দিন খড়কুটো সংগ্রহ করে কোকিলের বাসা তৈরি করে দেয়। দেখতে দেখতে এক সময় ছানাটা হৃষ্টপুষ্ট আর সবল হতে শুরু করে। সেও একসময় পাখা মেলে উড়াল দেয়। উড়তে উড়তে আকাশে যায় সে। প্রানভরে শান্তির নিশ্বাস নেয়। আহা! মনে হয় আকাশটা কত সুন্দর। মনে হয় সবাই যদি এভাবে মুক্ত আকাশে উড়ত, স্বাধীনভাবে চলতে পারত। আসলে যার যে জগৎ সে জগতে স্বাধীন থাকতে সবাই পছন্দ করে।

ছানার খুশি দেখে মা পাখিটার মন আনন্দে ভরে যায়। কোকিলের কাছে কৃতজ্ঞতা জানায় মা পাখিটা। মা ও ছানা পাখিসহ তারা প্রতিদিনই খাবারের খোঁজে উড়াল দেয় মুক্ত আকাশে। আর ভাবে আহা সুস্থ থাকার আনন্দটাই আলাদা। আর স্বাধীনতার কত সুখ !

বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোটো ব্যাঙ

আ ন ম আমিনুর রহমান

ছোট্ট বন্ধুরা– তোমরা তো ইতোমধ্যেই জেনে গেছো বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোট্ট পাখির নাম। এদেশে যেমন ছোট্ট পাখি আছে, তেমনি আছে ছোট্ট স্তন্যপায়ী প্রাণী, ছোট্ট সাপ, ছোট্ট গিরগিটি, এমনকি আছে ছোট্ট ব্যাঙ!

তোমরা কি জানো এদেশের সবচেয়ে ছোট্ট ব্যাঙ কোন্‌টি?

আজ আমি তোমাদের এদেশের সবচেয়ে ছোট্ট ব্যাঙের কথাই বলব। আমি কীভাবে এই ব্যাঙটি প্রথম দেখলাম সেই অভিজ্ঞতা দিয়েই না হয় আজকের গল্প শুরু করা যাক। মনোযোগ দিয়ে শুনবে কিন্তু!

২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট থানায় অবস্থিত কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে পাখি ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী দেখতে গেলাম। বিভিন্ন প্রজাতির পাখি ও বন্যপ্রাণী দেখা শেষে কালেঙ্গা অভয়ারণ্য থেকে অটোরিক্সায় শায়েস্তাগঞ্জের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু হঠাৎ-ই সিদ্ধান্ত পালটে একই থানায় অবস্থিত আরেকটি অভয়ারণ্য 'সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান'-এ চলে এলাম। ডরমিটরিতে ব্যাগ রেখে দুপুরের খাবার খেলাম। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বনের দিকে পা বাড়ালাম।

শুকনো বালুময় সাপের মতো এঁকেবেঁকে যাওয়া ছড়া ধরে ট্র্যাকিং করে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে দেখতে এগুচ্ছি। প্রায় দু'কিলোমিটার হাঁটার পর বন মোরগের ডাক কানে এল। মনে হলো কাছে কোনো ঝোপঝাড় থেকে ডাকছে। খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর গাছের ডালে টকটকে লাল মোরগটির দেখা পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ছবিও তোলা হয়ে গেল। এরপর বুনো পায়রা ও বুলবুলিসহ ৮–১০ প্রজাতির পাখির সঙ্গে দেখা হলো। সাথে বেশ কয়েক প্রজাতির প্রজাপতিও রয়েছে।

ছড়া ধরে হেঁটে চলেছি, হঠাৎই ঝরা পাতার উপর ছোট্ট কিছু একটা নড়াচড়া করে ওঠল। কিন্তু অনেক খোঁজাখুজির পরও ওর দেখা পেলাম না। তবে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র আমি নই। মূর্তির মতো ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলাম ওখানটায় যাতে ও আমার উপস্থিতি টের না পায়। কিছুক্ষণ পর ও আবার লাফিয়ে উঠল একটা ঝরা পাতার উপর। বালির রঙে রং, গায়ে বালিমাখা ও অত্যন্ত ছোটো হওয়ায় সহজে খুঁজে পাইনি। তাই বেশ সাবধানে ওর ছবি তুললাম। এর আগে দিনে-রাতে ওর জাতভাইদের বহু ছবি তুলেছি। কিন্তু ওকে কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না। তবে বেশ চেনা চেনা লাগছে। শুরুতে বাচ্চা প্রাণীই ভাবলাম। কিন্তু ঢাকায় ফেরার পর বইপত্র ঘেঁটে যা পেলাম, তাতে মনটা আনন্দে ভরে উঠল।

এতক্ষণ যার কথা বললাম সে এদেশের সবচেয়ে ছোট্ট ব্যাঙ, ময়মনসিংহের লাউবীচি ব্যাঙ। ময়মনসিংহের

টীনা ব্যাঙ নামেও পরিচিত এটি। ইংরেজিতে এই ব্যাঙের নাম Mymensingh Narrow-mouthed Frog বা Mymensingh Microhylid Frog। মাইক্রোহাইলিডি (Microhylidae) পরিবারের সদস্য এই ব্যাঙটির বৈজ্ঞানিক নাম *Microhyla mymensinghensis (মাইক্রোহাইলা মাইমেনসিংহেনসিস)*।

ছোট্ট এই ব্যাঙটি লম্বায় কতটুকু হয় জানো কি?

এটি লম্বায় মাত্র ১.৪২-২.১৫ সেন্টিমিটার (সেমি) হয়। জানা মতে, এখন পর্যন্ত এর চেয়ে ছোটো আকারের অন্য কোনো ব্যাঙ এদেশে আবিষ্কৃত হয়নি।

এদের দেহ গাট্টাগোট্টা। পিঠের চামড়ায় অসংখ্য আঁচিল দেখা যায়। এদের মাথা চওড়া। নাকের আগা ছাঁটা। দেহের উপরটা বাদামি থেকে সোনালি-বাদামি এবং পিঠে কালচে-বাদামি রঙের কারুকাজ রয়েছে। একটি কালো বন্ধনী নাকের আগা থেকে শুরু হয়ে নাকের ছিদ্র ও চোখ পার হয়ে পেছনের পায়ের কুঁচকিতে গিয়ে মিশেছে। দেহের নীচটা সাদাটে। সামনের ও পিছনের পায়ের আঙুলগুলো পাতাবিহীন এবং আঙুলের আগা ফোলা নয়। এই ব্যাঙের সঙ্গে বড়ো লাউবীচি ব্যাঙ (*Microhyla berdmori*) ও লাউবীচি ব্যাঙের (*Microhyla ornata*) চেহারার বেশ মিল রয়েছে।

এই ব্যাঙ এদেশের কোথায় কোথায় পাওয়া যায় তা কি তোমরা জানো?

হবিগঞ্জ, ময়মনসিংহ ইত্যাদি এলাকায়। তবে এছাড়াও সচরাচর দৃশ্যমান এই ব্যাঙটি টাঙ্গাইল ও নেত্রকোনা জেলার পাতাঝরা বন এবং সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের মিশ্র বিভিন্ন জেলার চিরসবুজ বনাঞ্চলে দেখা যায়।

এরা নিশাচর। অর্থাৎ এরা রাতের বেলা খাবারের জন্য বের হয়। দিনের বেলা জঙ্গলের স্যাঁতসেঁতে ও ছায়াযুক্ত স্থানে লুকিয়ে থাকে। সচরাচর একাকি দেখা যায়। স্যাঁতসেঁতে ঘাস ও ঝরঝরে মাটিতে বাস করে। ছোটো ছোটো কীটপতঙ্গ খায়।

এরা কীভাবে নিজেদের বংশবৃদ্ধি করে সে সম্পর্কে তেমন একটা তথ্য জানা যায় নি। তবে সচরাচর বর্ষাকালে মে থেকে জুলাই মাসের মধ্যেই এরা বংশবৃদ্ধির কাজটি করে থাকে।

কামনা করি এরা পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আজীবন বেঁচে থাকুক এদেশে। কারণ এরা বেঁচে না থাকলে প্রকৃতি বাঁচবে না, দেশ বাঁচবে না এবং সর্বোপরি আমরাও বাঁচব না।

৮ কোটি বছর আগের ব্যাঙ

বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্র আকৃতির ব্যাঙের খোঁজ মিলেছে ভারতে। দেশটির কেরালা ও তামিলনাড়ুর দুর্গম বনাঞ্চলে দীর্ঘদিন অনুসন্ধানের পর বিশ্বের ক্ষুদ্র আকৃতির চার প্রজাতির ব্যাঙের খোঁজ পায় একদল গবেষক। এসব ব্যাঙ আকারে এতই ছোট যে হাতের বুড়ো আঙুলের ওপর এদের কয়েকটিকে অনায়াসে রাখা যায়। ব্যাঙগুলোর মাথা থেকে পা পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ১২ থেকে ১৬ মিলিমিটারের মধ্যে। এসব ব্যাঙের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো এগুলো রাতে পোকার মতো শব্দ করতে পারে। ব্যাঙগুলোর ডিএনএ পরীক্ষা, শারীরিক গঠন ও ডাকার ধরন পরীক্ষা করে

মনে করা হচ্ছে ৭ থেকে ৮ কোটি বছর আগে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় বনাঞ্চলে এই জাতীয় ব্যাঙের অস্তিত্ব ছিল। এই প্রজাতির ব্যাঙের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো এগুলো মানুষের বাড়িঘরের আশপাশে মাটির সঙ্গে লেপ্টে থাকে।

গবেষণা দলের সহকারী দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সোনালি গার্গ-এর মতে এই ধরনের ছোট ব্যাঙ বিপন্ন হয়ে গেছে। আর এগুলো আকারে এতই ছোট যে এগুলো কোনো অনুসন্ধান দলের চোখে পড়ার কথা নয়। পোকার মতো শব্দ করতে পারে বলে প্রথমে এগুলোকে অনেকে ছোটো পোকাই বলে মনে করবে। কিন্তু হাতে নিয়ে দেখলে বোঝা যায় এগুলো আসলে ব্যাঙ।

৭ থেকে ৮ কোটি বছর আগের ব্যাঙ আবিষ্কারে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন ব্রিটেনের ফ্রগলাইফ সংগঠনের প্রধান ডক্টর লঁরা জারভিস। তিনি বলেন, ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এই নতুন আবিষ্কারের বৈশ্বিক মূল্য রয়েছে। গবেষণাটি প্রখ্যাত পারজে জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

মায়ের সাথে গল্প

নীলিমের ফিরে আসা

ড. শিল্পী ভদ্র

তুমি কখনো মা'র জন্য গভীর তৃষ্ণাবোধ করেছ? না করোনি। সে তৃষ্ণা যা খুব গরমে ঠান্ডা জলের জন্য প্রাণে দাপাদাপি শুরু করে তার চেয়েও কিছু বেশি। জানো, মা'র ভালোবাসা ফ্রিজের ঠান্ডার চেয়েও শীতল, আরো মধুর।

মা-কে এত ভালোবাসি; সে যে এত আপন তা আমি জীবনেও বুঝতাম না যদি এই বিপদে না পড়তাম। এমন করে কেউ পৃথিবীতে কারো জন্য ভাবে কি? যার মা আছে সে-ই রাজা এই পৃথিবীর। অথচ এই সোনা মা-কে এতদিন মনে হয়েছিল শত্রু বা তার চেয়েও বেশি কিছু। মনে হতো মা-র জন্য যত ঝামেলা! সবটাই তার চোখে পড়ে। সব কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সে না থাকলে নিজের মতো করে চলতে পারব। সব সময় মা বলতেই থাকে-এটা করো না, ওটা করা ভালো না, এভাবে চলো, ওভাবে বলো, কেন বুঝছ না, কেন মানছ না–এগুলো শুনতে শুনতে আমার কান পচে গিয়েছিল। বাইরে যতক্ষণ থাকতাম স্কুলে, বন্ধুদের সাথে ততক্ষণই শান্তি পেতাম। মনে হতো দূরে পালিয়ে যাই। যেখানে সারাদিন গেমস্ খেলতে পারব, ফেসবুক চালাতে পারব। ধুমধাড়াক্কা বিটের গান শুনব, নাচব, বিদেশি মুভি দেখব, বন্ধুদের সঙ্গে প্রাণ খুলে আড্ডা দেবো। দামি হোটেলে ফাস্ট ফুড খাবো। পড়ালেখার জন্য, স্কুলে যাবার জন্য, হোম ওয়ার্কের জন্য কারো বকবকানি থাকবে না। শাকসবজি, দুধ–আনটেস্টি খাবার খেতে বার বার এক কথা কেউ বলবে না।

: তার জন্যই কী বাসা ছেড়ে চলে গিয়েছিলে নীলিম!

: কী করব বলো, মাথা কি তখন ঠিক ছিল? ওই clash of clan বা যুদ্ধ যুদ্ধ গেমসটা যেদিন থেকে শুরু করেছিল সেদিন থেকেই এলাকা বাঁচাতে হামলা করতে হবে, যুদ্ধ করে জিততে হবে–এই চিন্তাই ঘুরত সব সময়। ক্লাস ফাঁকি দিয়ে, কোচিং বাদ দিয়ে, পরীক্ষা না দিয়ে, বন্ধুর বাসায় যাবার নাম করে, জরুরি অ্যাসাইনমেন্ট করার মতো সব মিথ্যা বলে গেমসটা খেলতে যেতাম।

: যাই করো, পরীক্ষা-পড়ালেখা বাদ দিয়ে ইন্টারনেটের গেমস, বন্ধুবান্ধব নিয়ে এত মাতামাতি তোমার ঠিক হয়নি।

: জানো না পবন, গেমসের যুদ্ধে যেতে না চাইলে বন্ধুরা ফোনের ওপর ফোন করে-করে ঠিক থাকতে দিত না। কারণ war এর নিয়ম হলো, সব মেম্বারকে এক সাথে war-এ যেতে হয়। যে এলাকা দখল করা হয়েছে তাকে বাঁচানোর জন্য। আমাদের টিমটা তখন ভারচুয়ালি অনেক টাকার মালিক হয়েছিল; একদিন আমাদের টিমের টিকো এসে আমাকে বলল—ওরা নাকি war-এর এলাকা সত্যি সত্যি দখল করেছে। এখন থেকে আমরাই তার মালিক। দখল বহাল রাখার জন্য নাকি সেখানে আমাদের বসবাস করতে হবে। বিল্ডিং বানাতে অনেক টাকার দরকার; জায়গা পেলেও যার-যার ঘর তার খরচেই বানাতে হবে। তাই সে আমাকে ঘর থেকে টাকা, সোনার গয়না সব নিয়ে পরদিন চার রাস্তার মোড়ে দুপুর ১১টায় যেতে বলল।

: বলল, আর তুমি চলে গেলে? আমাকেও তো জানাতে পারতে কথাটা?

: টিম লিডারের কড়া হুকুম ছিল কাক পক্ষীকেও না জানানোর, আর তোমাকে একটু শেয়ার করলে বিপদে তো আমিও পড়তাম না। অথচ মার আলমারি থেকে মাস খরচের টাকা, তার জমানো টাকা, মাটির ব্যাংক ভাঙা টাকা, মার অমন সুন্দর ভারি-ভারি গয়না, মোবাইল, ট্যাব, ল্যাপটপ—সব নিয়ে যাবার পর মাত্র দুদিন ওরা আমার সাথে ভালো ব্যবহার করেছিল। তখন মনে হয়েছিল ওরাই আমার পৃথিবীতে সবচেয়ে আপন। আমার ভালো যদি কেউ চায় তা সে আমার বন্ধুরা। বাবা-মা'র মুখ আর দেখব না ভেবেছিলাম ওদের দুদিনের ভালোবাসায়। যখন ঘর বানানো হয়ে যাবে তখন কারোর শাসন-ধমক শুনতে হবে না। ঘরের মালিক হব আর প্রাণের চেয়ে আপন বন্ধুদের সাথে আনন্দ-হট্টগোল করে জীবনটা নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দেবো। কিন্তু জাস্ট দু'দিন পরেই ওরা জানালো সব টাকা নাকি শেষ হয়ে গিয়েছে। আমাকে আরো অনেক টাকা আনতে হবে বাবা-মা'র কাছ থেকে।

: তখনই তোমার স্বপ্নভঙ্গ হলো নীলিম? যাদের তুমি জন্মের পর থেকে দেখে আসছ তারচেয়ে তোমার ওইসব ইন্টারনেটের পাতানো বন্ধুরা আপন হয়ে গিয়েছিল বলেই তো এমন ধাক্কাটা খেলে।

: আরে কথা না শুনলে ধাক্কা খাবো না! খুব অন্যায় করলে বাবা-মা শুধু একটা চড় বা থাপ্পর মারত। মা বার বার নিষেধ করত, কখনো বকত; তাতেই তাকে অপছন্দ করতাম। আর দুদিন পরই বাসা থেকে টাকা আনতে পারব না বলায় ওরা আমাকে বেতের লাঠি দিয়ে অনেক মেরেছিল। ওদের মার খেয়ে মা-মা বলে অনেক কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুম ভাঙার পর গায়ে প্রচণ্ড ব্যথা, সেইসাথে পেয়েছিল খুব ক্ষুধা। জানো তৃতীয় দিনের বিকালে ওরা আমাকে শুধু দুটো পাউরুটি খেতে দিয়েছিল। একলা একটা ঘরে মুখ-হাত বেঁধে আটকে রেখেছিল। রাতে খেতে চাইলাম কেউ এল না, ঘরটা অন্ধকার, কাউকে দেখতে পেলাম না। মাটির ওপর শুধু পাটিপাতা। তাতে চাদর, বিছানা, বালিশ কিছু নেই। অসহায় আমি মা-বাবা বলে বলে কাঁদলাম। তখন মনে পড়ছিল একটু খাবার খেলে মা যে কত খুশি হতেন। যেন খুব ভালো কাজ করে ফেলেছি। তার মুখে দেখতাম তৃপ্তির হাসি। কোনো কাজে বাইরে গেলেও বার বার জানতেন খেয়েছি কিনা, খাচ্ছি না কেন? আর আজ! খাবার চাইছি কেউ দিচ্ছে না। ক্ষুধার এমন জ্বালা আগে টের

মায়ের সাথে লুকোচুরি খেলা, কী মজা!

মা! কোথায় আমি?

পাইনি। বাবা অফিস থেকে ফেরার পথে ফল, বিস্কুট, চিপস্, চিকেন ফ্রাই, মোগলাই, কেক-যেদিন যেটা আনতে বলতাম আনতেন। বিকালে মা-ও কত খাবার বানাতেন-জুস, স্যুপ, নুডুলস, পিঠা, পায়েস-সবকিছু ছবির মতো ভেসে উঠছিল মনে আর কান্নায় চোখ ভিজে যাচ্ছিল। মাগো, বাবা তুমি কোথায়? বলে বার বার কষ্ট করে জোরে জোরে ডাকলাম। খুব ক্লান্তিতে বসে থাকতে পারছিলাম না। মাথা ঝিমঝিম করছিল। একটু নড়লে সারা গায়ে ব্যাথা। কাত হয়ে শুয়ে পড়লাম। এরপর যখন চোখ খুললাম তখন সকাল হয়েছে। একটু পরে দৈত্যের মতো কালো আর মোটা ৪টা লোক ঘরে হুড়মুড় করে ঢুকে আমার মুখে-চোখে এলোপাতারি ঘুষি মারল, একজন আমাকে উপরে তুলে আছাড় দিল, কেউ চুল ধরে টেনে ছিড়ল, সব জামাকাপড় খুলে ফেলল। আমার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল টপটপ করে। কী করব বুঝতে পারছিলাম না। আমাকে মারা থেকে জামা খোলা অবধি সবটার ছবি তুলছিল-লজ্জায়, মনের কষ্টে নিজের অজান্তেই বলছিলাম মাগো, বাবা তোমরা এসো। ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। আমাকে আরো টাকা আনতে বলছে। কী করব মা, বলো কি করব?

নীলিমদের পাশের বাড়ির এক ভদ্রলোক নীলিমের বাবাকে খুব পেরেসান দেখে গোপনে তাকে ডেকে বলেন, গাজীপুরে আপনার চাচা আকিজকে একবার বড়ো একটা উপকার করেছিল। এখন আপনার চাচার কথা আকিজ ফেলতে পারবে না। আপনি তার কাছে যান। দয়া করে আমি যে এসব আপনাকে বলেছি তা কাউকে বলবেন না। নীলিমের মতো সরল শিশুর মরণ বিপদ জেনে আর সহ্য করতে না পেরে আপনাকে এই গোপন খবর বললাম।

: সে ঠিক আছে আপনি ভাববেন না। আমি গাজীপুরে চাচার কাছে যাবো।

নীলিমের বাবা বিশাল বাড়িতে এসে নীলিমের মা ঈশিকাকে বললেন যে, চাচা কিছু টাকা দেবেন তা আনতে তাকে গাজীপুর যেতে হবে। কারণ ঐ ভদ্রলোক বলেছিলেন কাউকে না বলতে, তাতে বিপদেরই সম্ভাবনা থাকবে। বিশাল বাসায় ঈশিকার ভাই মিলনকে রেখে বেলা ৩টায় গাজীপুরে রওনা হলেন তার ভাই বিপ্লবকে নিয়ে। চাচাকে সে ফোনে জানালো বেড়াতে যাচ্ছে তার কাছে। চাচার কাছে পৌঁছাতে ৫টা বাজল। তখন বিশাল চাচাকে সব খুলে বললেন। তার হাতটা ধরে কেঁদে ফেলল— 'চাচা এখন আপনিই সহায়'।

চাচা বললেন— 'দাঁড়া, আকিজ চোরাই কাজ করে জানতাম। ছেলেধরা তা তো জানতাম না। যাই হোক, ব্যবস্থা হয়ে যাবে চিন্তা করিস না বাপ'। চাচা তার ম্যানেজারকে বলল আকিজকে ফোন করতে। আকিজ

চাচার কাছে সব শুনে বিশেষত নীলিম তার বংশধর জেনে বলল, সে ব্যবস্থা করবে। আকিজ শুনেছিল নীলিমই নাকি সন্ত্রাসী। সেটা পরে সে বুঝে নেবে। আগে চাচাজিকে চিন্তামুক্ত করাই তার কর্তব্য বলল।

এদিকে ঈশিকার আত্মীয়স্বজন, ভাইবোনদের কাছ থেকে জোগার করা ১০ লাখ টাকা মিলন তার হাতে দেয়। ঈশিকা তার ভাই আর পাড়ার নান্টুকে নিয়ে ডেরার ঠিকানায় রওনা দেন। মিলন তাকে অনেক মানা করে বিশাল ফিরে না আসা পর্যন্ত যেতে।

ঈশিকা ভিডিও দেখাঅবধি ভাবছিল নীলিমকে ওরা মেরেই ফেলবে টাকা না পেলে। তবু ১০ লাখ দিলে যদি ওরা একটু শান্ত থাকে সে ভাবনাতেও পাগলের মতো একাই ডেরায় পৌঁছে যায়। তার সাথে আসা মিলন, নান্টু তখন ছিল বেশ কিছু দূরে। নীলিম আটক থাকা টিনের ঘর থেকে মার কান্না শুনতে পাচ্ছিল। 'ওকে মেরো না,

মেরো না, সব টাকা পাবে তোমরা। আমি নিজে এসে সব দিয়ে যাবো। শুধু ওকে ছেড়ে দাও, আমার সোনাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও'।

ওরা নীলিমের মা-এর আসার কথা বসকে জানায়। কিন্তু ফোনে যে কী হলো কে জানে! নীলিমের চোখ বেঁধে ঘর থেকে ওকে ওর মা'র কাছে ঠেলে দিয়ে বলল-'নিয়ে যান, নিয়ে যান ওকে, আর দাঁড়াবেন না'।

ঈশিকা, চোখ বাঁধা নীলিমের হাত ধরে বোকা বনে গেল। কাঁদবে, কী হাসবে ভেবে পেলো না। ওকে নিয়ে এক দৌড়ে মিলন, নান্টুর কাছে চলে এল কখন সে নিজেও জানে না। হাঁপাতে লাগল। মিলন ফোন করে বিশালকে এখানে অপেক্ষারত অবস্থায় সব জানিয়েছিল, এবার উপসংহার জানালো। বিশাল, ঈশিকাকে এমন সাহসী কাজের জন্য ধন্যবাদ জানালো এবং তাকে ধীরেসুস্থে বাসায় ফিরতে বলল সবাইকে নিয়ে। সেও কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরবে ফোনে বলল।

পবন: এরপরের ঘটনা তো সিনেমার মতোই ভাই।

নীলিম: আর বলো না ভাই! আর ওই বন্ধুদের সাথে 'যুদ্ধ যুদ্ধ' খেলা কখনো খেলব না। ইন্টারনেটে আর বসব না কখনো।

: বসবে না কেন ভাই! নেটে সার্চ দিয়ে কত অজানা তথ্য জানা যায়-যা তোমার জানা দরকার এবং লেখাপড়ার অন্তর্ভুক্ত তা জানতে একে ব্যবহার করব। এর ডিকশনারি অংশে শব্দ এবং বিশুদ্ধ বানানের জন্য সার্চ দাও। অংক, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব শাখার প্রশ্নের সমাধান তুমি ইন্টারনেটের মধ্যে সার্চ দিলেই পাবে। এত উপকারী উপাদান থাকতে নীলিম তুমি যুদ্ধ, যুদ্ধ খেলাই বেছে নিলে? এটা কার দোষ বলো? ভালো-মন্দ সবকিছুতেই আছে, ভালোটা বেছে নেওয়া তোমার উপর। দেখো না আমিও তো নেট চালাই অথচ একে আমি কাজে লাগাই আমার ভালো রেজাল্ট হবার উপকরণ হিসেবে। ইন্টারনেটকে কাজে ব্যবহার করো, অপব্যবহার নয়। এ সময় ঈশিকা-বিশাল এল সেখানে। তারা বলল-আমরা এখন থেকে ঘরে বসেই লুডু, দাবা, চোর-পুলিশ, ক্যারম খেলব সবাই মিলে।

: কখন খেলব আমরা।

: তোমাদের লেখাপড়ার পর রাতের খাবারের শেষে। আজ রাত থেকেই খেলা শুরু করব। তারপর বাকিগুলোও আস্তে আস্তে খেলব।

: আমরা কিন্তু শুক্র-শনি ছুটির দিনে আমাদের আত্মীয়স্বজনের বাড়ি নিয়ে যাবো তোমাদের। আর ওরাও আসবে তোমাদের কাছে। একুশে ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর, ১লা বৈশাখ নানা অনুষ্ঠানে আমরা সাংস্কৃতিক জটলা করব। আর মাঝে মাঝে পিকনিকেও যাব সবাই মিলে হৈ হৈ করতে।

: কী মজা কী মজা!

: খেলা এবং লেখাপড়ায় ভালো করলেও তোমাদের জন্য থাকবে উপহার, ঠিক আছে?

: ঠিক আছে। সোনা বাবা-মা। নীলিম-পবন সমস্বরে বলে উঠল পারিবারিক বন্ধনই পারে ইন্টারনেট অপব্যবহার রোধ করতে।

মা : শায়লা হক তানজু
ছেলে : আহনাফ ইফতেখার সুফি
আলোকচিত্রী : নাসির আহমেদ সৌরভ

শপথ

ফাতেমা জান্নাত

চারিদিকে ঘন অন্ধকার। কোথাও কোনো সাড়া শব্দ নেই। দিনের লাল টুকটুকে সূর্যটা বিদায় নেওয়ার সাথে সাথে পুরো এলাকার লোকজন যে যার মতো নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়।

গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা বিশাল নদী পার হওয়ার একমাত্র ভরসা রহিম মাঝি। দিনের বেলা সাধারণ মানুষেরা পারাপার করলেও রাতে তেমন কেউ পার হয় না। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের পার করে দিতেই সারা রাত নৌকা নিয়ে বসে বসে অপেক্ষা করেন রহিম মাঝি। সেই সন্ধ্যেবেলা ছেলে জসীম কে নিয়ে আসেন, এখন রাত প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি। ফরিদ আর জামাল ওদের তো আজ পার হওয়ার কথা। এখনো আসছে না যে। কোনো সমস্যা হলো না তো! এসব ভাবতে ভাবতে রহিম মাঝি ছেলের দিকে তাকায়

-জসীম

-জ্বি

-তোর কি ক্ষিধে লাগছে?

-হ বাজান

-এই নে চিড়া আর গুড়।

বাড়ি থেকে আসার সময় পুটলিতে করে তা নিয়ে আসে রহিম মাঝি। জসীম একমুঠো চিড়া আর একটুকরো গুড় মুখে দিয়ে বাবার কাছে এসে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করে- -আর কতক্ষণ বাবা?

-কেন, তোর কি কষ্ট অইতাছে?

-না বাজান

-তাইলে?

-এতক্ষণ হলো ওরা যে আইতাছে না।

-হ, আইব বাজান।

জসীম উপরের দিকে তাকায়। কিছুক্ষণ পর জসীম বলে উঠল, 'ঐ দ্যাহ বাজান, মনে অয় ওরা আইসা গেছে'।

রহিম মাঝি নৌকা ঘাটে ভিড়ায়। সাথে সাথে তারা নৌকায় উঠে পড়ে।

-রহিম চাচা কেমন আছেন? ফরিদ প্রশ্ন করে

-পাকবাহিনী যেভাবে দিনদিন গ্রাম চষে বেড়াইতাছে, তাতে আর ভালো থাকবার পারি?

-চাচা চিন্তা কইরেন না, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাইবো।

-আমাদের গ্রামের ইদ্রিস আলি আছে না, হে কইছে রহিম মাঝি মুক্তিযোদ্ধাদের পার কইরা দেয়। হেরে শেষ কইরা দিতে অইবো।

-ভয় পাইয়েন না চাচা, একটু সাবধানে থাকবেন।

ততক্ষণে নৌকা ওপাড়ে গিয়ে ভিড়ালে সবাই নেমে

হাসান মুশফিক শাবাব, প্রথম শ্রেণি, পটুয়া কামরুল হাসান আর্ট স্কুল, মিরপুর, ঢাকা

পড়ে। যাওয়ার সময় ফরিদ কিছু টাকা রহিম মাঝির হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল--চাচা আপনার এ ঋণ আমরা কোনো দিন শোধ করতে পারব না।

-না বাজান এ আর এমনকি। তোমাদের পার কইরা দিতাছি বইলা নিজের মনে একটু শান্তি পাই। আর যাই হোক, যতদিন বাঁচি ততদিন তোমাদের নৌকায় পার কইরা দিমু।

সবাই নেমে গেলে রহিম মাঝি নৌকা ঘুরায়। উদ্দেশ্য নৌকাটা ঘাটে বেঁধে বাড়িতে যাবে। নৌকা পাড়ের কাছে ভিড়াতেই হঠাৎ উপর হতে কার যেন ডাক শুনতে পায় রহিম মাঝি। তাকাতেই বুকটা কেঁপে উঠল। এত ইদ্রিস আলি! পাকবাহিনীর সহযোগী। ওদের নানাভাবে সহযোগিতা করে। মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে নিয়ে যায় মিলিটারি ক্যাম্পে। তার কারণেই আজ গ্রামের লোকজন ঘর ছাড়া।

কিছু বলার আগেই গর্জে ওঠে ইদ্রিস আলি। সাথে তার কয়েকজন সাঙ্গ পাঙ্গ।

'এই রহিম্যা, তুমি নাকি মুক্তিযোদ্ধাদের পার কইরা দিতাছো'?

এ কথা শুনে রহিম মাঝি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রয়।

-'হ,পার কইরা দিতাছি, তাতে কি অইছে? তুমি তো পাকবাহিনীর দালাল'। বাবার পাশে দাঁড়িয়ে জসীম উত্তর দেয়-

কোন কথা না বলেই হাতে থাকা রাইফেল দিয়ে মুহূর্তেই গুলি ছুড়ে ইদ্রিস আলি। জসীম পানিতে ডুব দিয়ে প্রাণে বেঁচে গেলেও একটা গুলি লাগে রহিম মাঝির শরীরে। নৌকায় দাঁড়িয়ে থাকা রহিম মাঝির রক্তাক্ত দেহ পানির প্রবল স্রোত দিয়ে বয়ে যেতে থাকে...।

চিৎকার দিয়ে কেঁদে ওঠে জসীম।। নিষ্পাপ রহিম মাঝির একটাই অপরাধ, মুক্তিযোদ্ধাদের ভালোবেসে তাদের নৌকায় পার করে দেওয়া।

বাবার রক্তমাখা নৌকায় বসে শপথ নেয় জসীম-'স্বাধীনতার লাল-সবুজের পতাকা হাতে নিয়ে এই রক্তের বদলা নেবে'।

সপ্তম শ্রেণি, জুলাই আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, কানাইঘাট, সিলেট।

আমাদের অঙ্গিকার

সা'দ সাইফ

আমরা শিশু হটব না পিছু
এগিয়ে যাবো সামনে
বাঁধার প্রাচীর ফেলব ভেঙে
স্বপ্ন দেখি দু'নয়নে ।

আমরা শিশু জ্ঞান পিপাসু
আগামী দিনের কর্ণধার
জাতির মাথা করব উঁচু
এটাই মোদের অঙ্গীকার ।

১ম বর্ষ, ডা.আফিল উদ্দীন কলেজ, শার্শা, যশোর

হলদে পাখির বিয়ে

মো. রিদওয়ানুল ইসলাম রিফাত

হলদে পাখি হলদে পাখি হলদে পাখির বিয়ে,
বিয়ে খেতে আসবে শালিক রাঙা পালকি নিয়ে।
ময়না আসবে গয়না পরে কপালে তার টিপ,
জোনাকি সে জ্বলবে ঘরে আলোর এই প্রদীপ।
নাচবে ময়ূর পেখম মেলে সাজবে টিয়ে বর,
বাবুই পাখি সাজিয়ে দেবে তাদের বাসর ঘর।
মাছরাঙা আসবে সেজে টুনটুনি যে কাজি,
হলদে পাখি এবার বলো বিয়েতে কি তুমি রাজি?

অষ্টম শ্রেণি, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উচ্চ বিদ্যালয়, গাজীপুর

রাতের বেলায়

আনিশা রহমান (কথা)

রাতের বেলায় জানালা খুলে বাইরে তাকিয়ে দেখি,
উঠোনে করছে খেলা শত শত জোনাকি ।
আকাশে তাকিয়ে দেখি লক্ষ লক্ষ তারা,
তার মাঝে গোলগাল চাঁদ আছে একটা ।
চারদিকে তাকিয়ে দেখি নিশ্চুপ এই গ্রামটি,
শুধুই কথা বলছে এর গাছগাছালি ।
আরও আছে ফুল ও পাখপাখালি,
সবাই মিলে করছে হরেক রকম গল্প,
দেখতে দেখতে রাতে ঘুম হলো আমার অল্প ।

সপ্তম শ্রেণি, উইল্‌স লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

স্বাধীন দেশ

আদনান শাহরিয়ার

স্বাধীনতা সবার প্রিয়
এই কথাটা সর্বদা বলি
স্বাধীন দেশের মানুষ মোরা
স্বাধীন ভাবে চলি।

স্বাধীনতার জন্য বীর বাঙালি
প্রাণ দিয়েছে হেসে
জীবন দিয়ে যুদ্ধ করে
দেশকে ভালোবেসে

প্রথম সেমিস্টার, ইউসেফ টেকনিক্যাল কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।

মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ উন্মুক্ত করল পাঁচ হাজার ছবি

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণা এবং প্রচার নিয়ে কাজ করছে মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ। মুক্তিযুদ্ধের বই, দলিল, সংবাদপত্র, ডকুমেন্টারি, ভিডিও ফুটেজ, চলচ্চিত্র, অডিও এবং ছবির ডিজিটাল লাইব্রেরি তথা ই-আর্কাইভ হলো মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ। যে-কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিনামূল্যে এ আর্কাইভে ঢুকে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ছবি দেখতে ও সংগ্রহ করতে পারবেন। সে ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের আরো ৫ হাজার ছবি উন্মুক্ত করা করল মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ।

এই ছবিগুলোতে পাকিস্তানিদের সংঘটিত বাঙালি গণহত্যা, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অভিযান, শরণার্থীদের করুণ চিত্র, বঙ্গবন্ধু, বাঙালির রাজনৈতিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে বিজয়সহ পাঁচ হাজার ছবি উন্মুক্ত করেছে এসব ছবিগুলোর ফটোগ্রাফারের নাম ও মূল ক্যাপশনসহ অনলাইনে বিনামূল্যে প্রদর্শনের জন্য উন্মুক্ত করেছে মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ। ঐতিহাসিক এই ছবিগুলো স্টক ফটোগ্রাফি আর্কাইভ- ম্যাগনাম, গেটি, এপি, হুলটন, ব্যাটম্যান, ম্যাজরিটি ওয়ার্ল্ডসহ বিভিন্ন ফটোগ্রাফারের ব্যক্তিগত আর্কাইভ হতে সংগ্রহ করা হয়েছে।

ছবিগুলোর কপিরাইট ও প্রদর্শনের অনুমতি সম্পর্কে মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ট্রাস্টের পরিচালক সাব্বির হোসাইন বলেন, এ ছবিগুলোর কপিরাইটের মালিক মূল স্টক ফটোগ্রাফি আর্কাইভগুলো বিনামূল্যে উন্মুক্ত প্রদর্শনের জন্য হাইরেজুলেশানে একটি নির্দিষ্ট প্রিভিউ সাইজ নির্ধারণ করে দিয়েছে। বর্তমানে এরকম ১৩০০ টি হাইরেজুলেশান ছবির প্রদর্শন আমরা অনলাইনে উন্মুক্ত করেছি, বাকি ছবিগুলো প্রতিনিয়ত সংযোজন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশি ফটোগ্রাফার রশীদ তালুকদার, মোহাম্মদ শফি, নাইব উদ্দিন আহমেদ, আফতাব আহমেদ, আবদুল হামিদ রায়হান, গোলাম মাওলা, জালালুদ্দীন হায়দার, আনোয়ার হোসেন, মনজুর আলম বেগ, শফিকুল ইসলাম স্বপন, আবুল লাইস শ্যামল, সাখাওয়াত হোসেইন, ভারতীয় ফটোগ্রাফার রঘু রায়, কিশোর পারেখ, অমিয় তরফদার, বাল কৃষ্ণ, রবীন সেনগুপ্ত, সন্তোষ বসাক, মানবেন্দ্র মন্ডল, জার্মান ফটোগ্রাফার থমাস বিলহার্ডট, হর্স্ট ফাস, আমেরিকান ফটোগ্রাফার ডেভিড কেননারলি, ডেভিড বার্নেট, ম্যারি এলেন মার্ক, ডিক ডুরান্স, ব্রিটিশ ফটোগ্রাফার উইলিয়াম লাভলেইস, ডন ম্যাককালিন, ক্রিস পার্কিনস, জন ডাউনিং, মার্ক এডওয়ার্ডস, মেরিলিন সিলভারস্টোন, সুইডিশ ফটোগ্রাফার বো কার্লসন, আফ্রো-ইউরোপিয়ান ফটোগ্রাফার ড্যানিস নিল্ড, ফ্রেঞ্চ ফটোগ্রাফার মাইকেল লরেন্ট, মার্ক রিবৌদ, ক্রিশ্চিয়ান সিমোনপিয়েত্রি, রেমন্ড ডেপার্ডন, ব্রুনো বার্বে, আব্বাস আত্তার সহ দেশি-বিদেশি ফটোগ্রাফার ও সংবাদ মাধ্যমের তোলা মুক্তিযুদ্ধের এই হাইরেজুলেশান ছবিগুলো বিনামূল্যে দেখা যাবে মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ট্রাস্টের ওয়েবসাইটে।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে ছেলে-মেয়েদের সুপথে ফিরিয়ে আনার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন ২০১৭'-এর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিপথে যাওয়া ছেলে মেয়েরা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মধ্যদিয়ে সুপথে ফিরে আসবে এবং বই দিয়ে ছেলে মেয়েদের বিপথে যাওয়া থেকে উদ্ধার করা যায়। তিনি সবাইকে বেশি বেশি বই পড়ার আহ্বান জানান এবং বাংলা ভাষাকে বিশ্ব দরবারে ছড়িয়ে দিতে প্রকাশকদের তাগিদ দেন।

শিক্ষকদের মানোন্নয়নে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ জানুয়ারি হোটেল রেডিসন ব্লু তে ৩ দিনব্যাপী ই-নাইনভিত্তিক দেশগুলোর মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার উন্নয়নে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের তথ্য তুলে ধরেন। তিনি শিক্ষকদের পেশগত মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং পেশার জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় নিয়ে নীতিগত উপায় উদ্ভাবন এবং বিশেষ প্রণোদনার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে বলে উল্লেখ করেন। এছাড়া তিনি ইউনেস্কোর ই-নাইনভিত্তিক দেশগুলোর উদ্যোগগুলোকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) সঙ্গে সমন্বয় করে সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

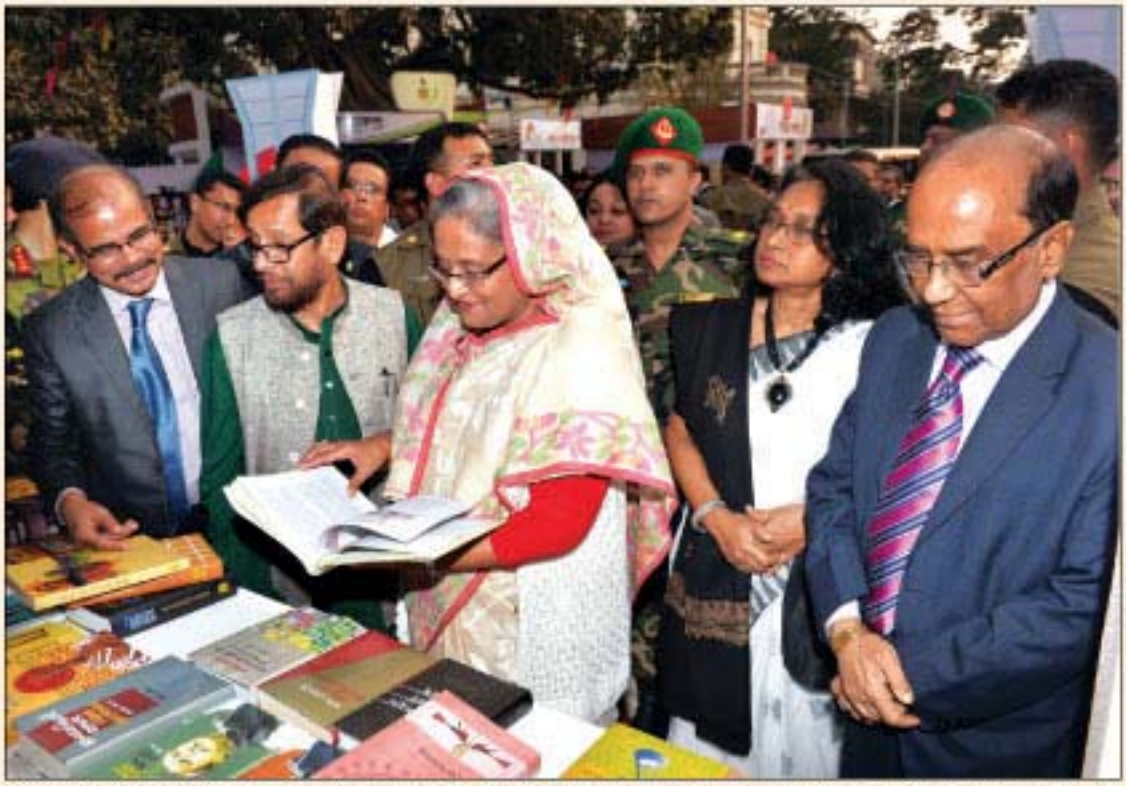

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অমর একুশে গ্রন্থমেলা ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন ২০১৭-এর উদ্‌বোধন শেষে মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন —পিআইডি

জাতীয় ইমাম সম্মেলন ও শিশু-কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় ইমাম সম্মেলন ও শিশু-কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সনদ ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ উচ্ছেদ করে দেশে শান্তি, স্থিতিশীল এবং উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সরকারের জঙ্গিবাদবিরোধী কর্মকাণ্ডে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য ইমাম এবং আলেমদের আরো সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান। এছাড়া সরকার দেশের সব জেলা-উপজেলায় ইসলামি কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী।

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট আইন ২০১৭-এর খসড়ার অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট রূপান্তর করতে 'শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট আইন-২০১৭'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দেন। এছাড়া 'জাতীয় যুবনীতি ২০১৭' অনুমোদন করে মন্ত্রিসভা। নতুন যুবনীতিতে যুবদের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছর রাখা হয়েছে।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

গণহত্যার জাতীয় স্বীকৃতি

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা তো জানো ২৬ মার্চ আমাদের স্বাধীতা দিবস। এই দিনে আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতা দিবসের আগের রাত ছিল আমাদের জন্য কালরাত। এই রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের ওপর চালিয়েছিল নির্মম হত্যাকাণ্ড। চালায় অপারেশন সার্চ লাইট নামে ইতিহাসের সবচেয়ে ঘৃণ্য হত্যাযজ্ঞ। ঘুমিয়ে থাকা নিরস্ত্র শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোর ওপর ট্যাংক, কামান, মেশিনগান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পাকিস্তানি বাহিনী। চারদিকে আগুন, মানুষের চিৎকার, গোলাবারুদের শব্দে ভারী হয়ে উঠেছিল ঢাকা শহরের পরিবেশ। আগুন জ্বালিয়ে দেয় বিশ্ববিদ্যালয় হল, রাজারবাগ পুলিশ লাইনসহ গুরুত্বপূর্ণ সকল অফিস, প্রতিষ্ঠানে।

পাকিস্তানি সরকার আজও এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা অস্বীকার করে চলেছে। আমাদের ইতিহাসের এই জঘন্য ঘটনা তোমাদের জানাতে সরকার জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ২৫ মার্চকে জাতীয় গণহত্যা দিবস পালনের প্রস্তাব জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতভাবে পাস হয়েছে। এই স্বীকৃতির মাধ্যমে আমাদের আদায় করে নিতে হবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

তোমাদের জন্য আরেকটু তথ্য দেই সেটি হলো- ১৯৪৮ সালের ৯ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত রেজ্যুলেশন ২৬০(৩)-এর অধীনে গণহত্যাকে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। সংজ্ঞা অনুযায়ী গণহত্যা শুধু হত্যাকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এক্ষেত্রে জাতিগত, গোষ্ঠীগত বা ধর্মগত নিধনের উদ্দেশে যদি একটি লোককেও হত্যা করা হয় সেটাও গণহত্যা। যদি কোনো জাতি, গোষ্ঠী বা বিশেষ ধর্মের মানুষের জন্ম রুদ্ধ করার প্রয়াস নেওয়া হয় বা পরিকল্পিতভাবে বিশেষ জাতি ও গোষ্ঠীভুক্ত নারীর গর্ভে একটি ভিন্ন জাতির জন্ম দেওয়ার চেষ্টা করা হয় সেটাও গণহত্যা। তবে শেষের বিষয়টিকে 'জেনোসাইডাল রেপ' বলা হয়। সব গণহত্যাকেই Organized crime হিসেবে প্রমাণ করতে হয়। আর সভ্যতাবিনাশী এ প্রবণতাকে রোধ করার জন্যই রচিত হয়েছে 'জেনোসাইড কনভেনশন'।

ছোট্ট বন্ধুরা গণহত্যা দিবসের স্বীকৃতি আমরা পেয়ে গেছি। এখন বিশ্বকে নতুন করে আবার জানাতে হবে আমাদের ইতিহাসের কথা। আদায় করতে হবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। কেননা এগিয়ে যাওয়ার মশাল তো তোমাদের হাতে।

শিক্ষা সংবাদ

মুক্তির উৎসব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ২৪শে ফেব্রুয়ারি শিক্ষার্থীদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজন করে 'মুক্তির উৎসব'। মাথায় লাল-সবুজের টুপি নিজ নিজ স্কুল পোশাক পরা আর জয়বাংলা স্লোগানে উল্লসিত হয়ে উঠে হাজারো শিক্ষার্থী। তারা পথ নেয় মানবিক সমাজ গড়ার।

এই উৎসবের স্লোগান ছিল 'আমাদের অঙ্গীকার অসাম্প্রদায়িক মানবিক সমাজ নির্মাণ'। শপথবাক্য পড়ান ক্যাপ্টেন আকরাম আহমেদ। শপথের সঙ্গে কিছু স্বপ্ন গেঁথে দেন শিক্ষাবিদ জাফর ইকবাল। আহ্বান জানান নতুন যুদ্ধে যাবার। যে যুদ্ধ গড়বে নতুন বাংলাদেশ। যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিল বঙ্গবন্ধু। যার জন্য যুদ্ধ করেছিল আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা।

সকালে পতাকা উত্তোলন আর জাতীয় সংগীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর নৃত্যালেখ্য। সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাঝে মাঝে চলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণের গল্প। পর্বতারোহী নিশাত মজুমদারও এসেছিলেন আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে। শুনিয়েছেন তার অভিযাত্রার কথা। এবারের স্বাধীনতা দিবসের একাত্তরের শরণার্থি ও বিপন্ন মানুষের কথা স্মরণ করে শহীদ মিনার থেকে সাভারের স্মৃতিসৌধে হেঁটে যাবেন নিশাত মজুমদার। শিক্ষার্থীদের সেই অভিযানে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান। উৎসবস্থলের পাশে ছিল ভ্রাম্যমান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, সেখানে ছিল ছবি আর সংবাদের প্রদর্শনী। অনুষ্ঠানের ফাকে শিক্ষার্থীরা লাইন ধরে দেখে এই ভ্রাম্যমান জাদুঘর। বিশ্ববিদ্যালয় মাঠটি সেদিন হয়ে উঠেছিল আনন্দের প্রাণকেন্দ্র।

প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ

তোমাদের জন্য বই

কমিকস ভয়ঙ্কর পোকা

আহসান হাবীব

বাংলাদেশের সব বয়সের কমিকসপ্রিয় পাঠকের কাছে সবচেয়ে প্রিয় নামটি হচ্ছে আহসান হাবীব। মজার পত্রিকা 'উন্মাদ'-এর সম্পাদক। সৃষ্টি করেছেন পটলা-ক্যাবলা, পল্টু-বিল্টুর মতো বিখ্যাত কমিকস চরিত্র। এবারের অমর একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর নতুন কমিকস বই 'ভয়ঙ্কর পোকা'। প্রকাশ করেছে শিশুরাজ্য প্রকাশন।

তোমাদের লেখা বই

পড়শী

মীম নোশিন নাওয়াল খান

মীম নোশিন নাওয়াল খান, পড়ছে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে, দশম শ্রেণি, ইংলিশ মিডিয়ামে। ছোটোকাল থেকেই লিখছে সে। নবারুণের প্রিয় খুদে এই লেখক এর মধ্যেই পেয়ে গেছে মীনা অ্যাওয়ার্ডসহ নানা পুরস্কার ও সম্মাননা। এবারের অমর একুশে বইমেলাতে এসেছে মীম-এর লেখা 'পড়শী'।

দুষ্টু বিড়ালছানা

তাসনিম ঐশী

যারিন তাসনিম ঐশীর জন্ম ২০০৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি। দুই বোনের মধ্যে সে ছোটো । পড়ে সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজে, মালিবাগ শাখার ইংরেজি ভার্সনে। লেখালেখিতে আগমন গল্প লেখার মাধ্যমে। পড়ালেখার পাশাপাশি খুদে এই লেখক একটি গল্পের বইও বের করেছে। নাম 'দুষ্টু বিড়ালছানা'। বইটি প্রকাশিত হয়েছে সপ্তডিঙা থেকে।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন পাস

'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭' জাতীয় সংসদে ২৭ ফেব্রুয়ারি পাস হয়েছে। মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮ এবং ছেলেদের ২১ বহাল রেখে বিলটি সংসদে কণ্ঠভোটে পাস হয়। বিলটি উত্থাপন করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি।

উত্থাপিত বিলের ১৯ দফায় বলা হয়েছে, এই আইনের অন্যান্য বিধানে যা কিছু থাকুক না কেন, কোনো বিশেষ প্রেক্ষাপটে অপ্রাপ্তবয়স্ক কোনো নারীর সর্বোত্তম স্বার্থে আদালতের নির্দেশনাক্রমে এবং মাতাপিতার সম্মতিক্রমে বিধি দ্বারা নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বিয়ে সম্পাদিত হলে তা এই আইনের অধীন অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

পপ-আপ বই

বইয়ের জগতে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে আমাদের রুমানা শারমীন। সেগুলোকে বলে 'পপ-আপ বই'। বইগুলোর ভাঁজ খুললেই পাতায় পাতায় উঠে আসে ত্রিমাত্রিক দৃশ্য। তৈরি হয় গল্প। বিশেষ প্রিন্টিং কৌশল ব্যবহার করে পাতায় পাতায় সাজানো হয়েছে গল্পের বিভিন্ন দৃশ্য। বইয়ের ভেতরে ভাঁজ করে রাখা এসব দৃশ্য পৃষ্ঠা ওলটানোর সঙ্গে সঙ্গে ভাঁজ খুলে দাঁড়িয়ে যায়। গল্পটা তখন আক্ষরিক অর্থেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বিশেষ ধরনের কাগজ, স্টিকার আর বিশেষ বাঁধাইয়ের মাধ্যমে প্রতিটি পাতায় গল্পের ছবি উঠে আসে ত্রিমাত্রিক আকারে।

আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের (এআইইউবি) স্থাপত্য বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করা রুমানা শারমীন ২০১৪ সালে 'দ্য পপ-আপ ফ্যাক্টরি' নামে প্রকাশনা শুরু করেন। ২০১৫ সালের একুশে বইমেলায় শিশুতোষ গল্পের 'পপ-আপ বই' প্রথম আনে রুমানা। ব্যাপক সাড়াও পান তিনি। আগামী বইমেলায় তার এরকম ১০টি বই বেরুবে। বর্তমানে পপ-আপ বইয়ের পাশাপাশি গুগল কার্ডবোর্ড (ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি প্রযুক্তির ছবি দেখার যন্ত্র) নিয়েও কাজ করছে।

তথ্যচিত্র নির্মাণে পুরস্কার পেল বাংলাদেশের নভেরা

জাপানের জাতীয় সম্প্রচার সংস্থা এনএইচকের জাপান প্রাইজ ইভেন্টের প্রথম পুরস্কার জিতে নিয়েছে বাংলাদেশের মেয়ে নভেরা হাসান নিক্কন। সম্প্রতি এইএইচকের জাপান প্রাইজ ২০১৬- এর ৫২তম আসরে

'দ্য গার্লস আর নট ব্রাইডস' (মেয়েরা বিয়ের কনে নয়) নামক প্রস্তাবিত তথ্যচিত্রের জন্য তাকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

১৯ বছর বয়েসি ধ্রুপদ কমিউনিকেশনের সহকারী প্রযোজক নভেরা নিক্কনের প্রস্তাবিত তথ্যচিত্রটির বিষয়বস্তু ছিল বাল্যবিবাহ ও অপরিণত গর্ভধারণের কুফল থেকে বাংলাদেশের মেয়েদের রক্ষা করার প্রত্যয়। উল্লেখ্য, শিক্ষামূলক টিভি প্রোগ্রাম তৈরির অসাধারণ পরিকল্পনা আছে কিন্তু প্রয়োজনীয় উপকরণ নেই এ রকম নির্মাতাদের বেছে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয় এ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে।

চার বছর বয়সে আট ভাষা রপ্ত

রাশিয়ার মস্কোর মাত্র চার বছর বয়সি এক কন্যাশিশু আটটি বিদেশি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে। সে প্রতিভার নাম বেল্লা দেভিয়াতকিনা। সম্প্রতি রাশিয়ার

রাষ্ট্রীয় টিভি চ্যানেলের একটি রিয়েলিটি শোতে ওই শিশু রুশ, ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, স্প্যানিশ, ইতালিয়ান, চায়নিজ ও আরবি ভাষায় তার পারদর্শিতা প্রমাণ করেছে।

বেল্লা দেভিয়াতকিনার বয়স যখন দুই বছর, তখন থেকেই সে রুশ ভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা শিখতে শুরু করে। ভাষার প্রতি তার আগ্রহ থেকেই ধীরে ধীরে যোগ হতে থাকে নতুন নতুন বিদেশি ভাষা। রিয়েলিটি শোতে তার এ অসাধারণ প্রতিভা দেখে রীতিমতো অবাক হয়েছিলেন বিচারকসহ উপস্থিত দর্শকরা।

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

স্বাস্থ্য : শিশু বিকাশ

আর নয় কোমল পানীয়

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা সবাই কোমল পানীয় পান করে খুব মজা পাও তাই না? কিন্তু তোমরা কি জানো এই কোমল পানীয় পান করলে কি কি ক্ষতি হয়? তবে জেনে নাও–

মস্তিষ্কের ক্ষতি

কোমল পানীয়তে এসপারটেম নামে এক ধরনের কৃত্রিম মিষ্টি ব্যবহার করা হয়। যা মস্তিষ্কের কোষের জন্য ক্ষতিকর।

দাঁত শিরশির করা

মুখের ভেতরের পিএইচের মাত্রা কোমল পানীয়তে থাকা ফসফরিক এসিড ও সাইট্রিক এসিড অনেক বেড়ে যায় ফলে এতে এনামেল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও দাঁত শিরশির করে।

ত্বকে র‍্যাশ

কিছু সোডায় ব্রেমিনেটেড ভেজিটেবল অয়েল বা বিভিও থাকে, যা ত্বকে র‍্যাশ তৈরি করতে পারে এবং স্নায়ুকে অকেজো করতে পারে।

রক্তে বাড়তি চর্বি

প্রতিদিন এক গ্লাস কোমল পানীয় পান করলে রক্তে ট্রাইগিসারডের মাত্রা ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ে।

বয়সের ছাপ

এগুলোতে ফসফটেজ ও ফসফরিক এসিড থাকে; যা কোমল পানীয়কে দীর্ঘ সময় ভালো রাখে; কিন্তু শরীরের কোষে বয়সের ছাপ ফেলে।

মেটাবলিক সিনড্রোম

প্রতিদিন এক গ্লাস পরিমাণ কোমল পানীয় পান করলে মেটাবলিক অসুখের হার ৩৬ শতাংশ বাড়ে। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে ৬৭ শতাংশ।

স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি

কোমল পানীয়ের বোতলে থাকে বিপিএ নামের এক ধরনের রাসায়নিক, যা হরমোনার মাত্রা পরিবর্তন করে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়।

ডায়েট পানীয়

সাধারণ কোমল পানীয় তো বটেই, ডায়েট পানীয় পানকারীদের ওজনও অনেক বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে পেটে চর্বি জমে।

উচ্চ রক্তচাপ

প্রতি গ্লাস কোমল পানীয় পান করলে রক্তচাপের সিস্টোলিক অংশ বাড়ে ১.১ সিমি/পারদ, ডায়াস্টোলিক চাপ বাড়ে ০.৪ মিমি/পারদ।

কিডনি পাথর

প্রতিদিন এক বা তার অধিক গ্লাস কোমল পানীয় পান করলে কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় ৩৩ শতাংশ বাড়ে।

ফ্যাটি লিভার

অ্যালকোহল পান না করেও যদি কেউ প্রতিদিন এক গ্লাস করে ছয় মাস কোমল পানীয় পান করে, তবে তার ফ্যাটি লিভার হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে দেড় গুণ।

বার বার প্রস্রাব

প্রস্রাব ইনফেকশনের প্রবণতা বাড়ায়; যদিও কোলাজাতীয় কোমল পানীয় পান করলে বার বার প্রস্রাব হওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়। কিন্তু কিডনি যথাযথ কাজ করতে পারে না বলে ইনফেকশনের হার বাড়ে।

এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যান্সার

রজোনিবৃত্তির পর যেসব নারী বেশি বেশি কোমল পানীয় পান করে, তাদের এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যান্সারের ঝুঁকি ৭৮ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ে।

প্রোস্টেট ক্যান্সার

প্রতিদিন এক গ্লাস পরিমাণ কোমল পানীয় পানে প্রোস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকি ৪০ শতাংশ বাড়ে।

প্যানক্রিয়াজ ক্যান্সার

দুই বা তার বেশি গ্লাস কোমল পানীয় দৈনিক পান করলে প্যানক্রিয়াজ ক্যান্সারের ঝুঁকি ৮৭ শতাংশ বাড়ে।

ডিপ্রেশন

নিয়মিত কোমল পানীয় পান করলে এতে থাকা এসপারটেন ও অন্যান্য কৃত্রিম চিনি বিষণ্ণতার ঝুঁকি বাড়ায় ৩৬ শতাংশ পর্যন্ত।

উগ্র আচরণ

প্রতিদিন চার থেকে পাঁচ গ্লাস কোমল পানীয় পান করলে তার মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত উগ্র আচরণ দেখা দিতে পারে।

তাই বন্ধুরা, তোমরা নিজেরা কোমল পানীয় পান থেকে বিরত থাকবে এবং বড়োদেরকেও নিষেধ করবে।

প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন

ভূমিহীন পরিবারকে বাড়ি উপহার

ময়মনসিংহের গফরগাঁও-এ দুই শতাধিক অসহায় দুঃস্থ ভূমিহীন পরিবারকে বাড়ি উপহার দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র দেওয়া অঙ্গীকার বাস্তবে রূপ দিয়েছেন গফরগাঁও-এর স্থানীয় এমপি। প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার, সারাদেশে একজন মানুষও আশ্রয়হীন থাকবে না। সে লক্ষ্যে দুঃস্থ ভূমিহীন ২৩০টি পরিবারকে তিনটি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারকে আড়াই শতাংশ জমিসহ সেমিপাকা বাড়ি নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। প্রতি পাঁচটি পরিবারের জন্য একটি করে পাঁচ কক্ষের ব্যারাক, টিউবওয়েল ও টয়লেট তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি আশ্রয়ণ

প্রকল্পের জন্য একটি করে পুকুর ও খেলার মাঠ রয়েছে। নির্মিত হবে কমিউনিটি সেন্টার ও স্কুল । পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের সাবলম্বী করার জন্য পরবর্তীতে কৃষি, মৎস্য চাষ, পশু পালন, সেলাইসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও ঋণের ব্যবস্থা করা হবে।

পথশিশুদের ব্যাংক হিসাব

আমাদের দেশের সুবিধাবঞ্চিত পথ ও কর্মজীবী শিশু-কিশোররা সঞ্চয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যেই ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১৭টি বাণিজ্যিক ব্যাংকে পথশিশুদের হিসাব বা অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে ৩ হাজার ৫৭২টি। এসব হিসাবের বিপরীতে তাদের জমানো টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৩ লাখ ৮৫১ টাকা। বেসরকারি সংস্থা এনজিওর সহায়তায় এসব অ্যাকাউন্ট খোলা ও পরিচালনা করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে জানা যায়, ২০১৪ সালের ৯ মার্চ ১০ টাকার নামমাত্র জামানতে পথশিশুদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগ করে দিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাসা-বাড়িতে সৌরশক্তি ব্যবহারে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম

বাসা-বাড়িতে সৌরশক্তি ব্যবহারে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি খাত বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান। ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তিনদিনের 'বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঅভশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এক্সপো অ্যান্ড ডায়ালগ'-এর দ্বিতীয় দিনে ক্রস বর্ডার ডায়ালগে তিনি এ কথা জানান।

কীটপতঙ্গ দমনে সৌরচালিত আলোক ফাঁদ

ফসলের মাঠে কীটপতঙ্গ দমনের জন্য সৌর শক্তি চালিত নতুন আলোক ফাঁদ উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট। এই ফাঁদ দেশের ফসলের মাঠে কীটপতঙ্গ শনাক্তকরণ, পর্যবেক্ষণ ও দমনে সহায়তা হবে। নতুন এই আলোক ফাঁদ মাঠে একবার স্থাপন করলে সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সূর্যের আলোর অনুপস্থিতিতে জ্বলে উঠবে এবং সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে আবার নিভে যাবে।

বাংলাদেশে ফসলের মাঠে পোকা দমনের জন্য মূলত রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় যা মারাত্মক ক্ষতিকর। বিজ্ঞানীদের মতে নতুন এ উদ্ভাবন ক্ষতিকর কীটনাশকের ব্যবহার কমানোর পাশাপাশি পরিবেশ নির্মল থাকবে। *প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা*

ক্রীড়া সংবাদ

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৬

শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলার গুরুত্বও রয়েছে। সাংস্কৃতিক চেতনায় শিক্ষিত সমাজ গঠনে খেলাধুলাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আর তাই বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার চিন্তা-চেতনাকে শিশু-কিশোরদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে এ বছর চূড়ান্তভাবে আয়োজিত হয় 'বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট' ও 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট' ২০১৬। টুর্নামেন্টের সার্বিক আয়োজনে ছিল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এবারের আসরে টুর্নামেন্ট দুটির জাতীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত খেলা ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ থেকে শুরু হয়ে ২ মার্চ ২০১৭ ফাইনাল খেলার মধ্য দিয়ে শেষ হয়। এর পূর্বে ২০১৬ সালের মে মাসের মধ্যে ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা পর্যায়ের খেলা এবং অক্টোবর মাসের মধ্যে বিভাগীয় পর্যায়ের খেলা সম্পন্ন করা হয়। টুর্নামেন্ট দুটির চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় এবার সাতটি বিভাগের ১৪ টি চ্যাম্পিয়ন দল অংশগ্রহণ করে। টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় ২ মার্চ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে। ফাইনাল খেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান। এবার বালক বিভাগে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয় কক্সবাজারের টেটং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং রানার্স আপ হয় সিলেটের কামরাঙ্গি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বালিকা বিভাগে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে লালমনিরহাটের টেপুরগাড়ি বিকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং রানার্স আপ রাজশাহীর বড়বাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। খেলা শেষে প্রধান

অতিথি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুই বিভাগের বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। পুরস্কার হিসেবে চ্যাম্পিয়ন হওয়া দুই স্কুলের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের হাতে স্বর্ণ পদক ও এক লাখ টাকা প্রাইজমানি দেওয়া হয়।

পাট দিবসে ২০০ ফুট পাটের ক্যানভাসে চিত্রাঙ্কন

পাট বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল। পাটের জীবন রহস্য উন্মোচনের পর থেকে পাট নিয়ে

গবেষণার শেষ নেই। তবে এবার গবেষণার পাশাপাশি যুক্ত হলো পাটজাত দ্রব্য নিয়ে অভিনব শিল্পকর্ম। ৬ মার্চ প্রথমবারের মতো পালিত হয় 'জাতীয় পাট দিবস-২০১৭'। এ দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচির পাশাপাশি ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। সে লক্ষ্যে ৫ মার্চ জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় ২০০ ফুট পাটের ক্যানভাসে চিত্রাঙ্কনের এক অভিনব আয়োজন করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। এতে অংশ নেন দেশের বরেণ্য চিত্রশিল্পী ও চারুকলার শিক্ষার্থীরা। তবে বিশ্বে এমন কোনো নজির নেই যেখানে ২০০ ফুট পাটের ক্যানভাসে চিত্রাঙ্কানে হয়েছে।

জাতির পিতার ৯৮তম জন্মদিবসে টুঙ্গিপাড়ায় বইমেলা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ১৭ মার্চ - ১৯ মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত জাতির পিতার সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় বইমেলা। ১৭ মার্চ মেলা উদ্‌বোধন করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মেলায় অনুষ্ঠিত হয় শিশু সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতিবছরের মতো এবারের মেলায়ও ছিল তথ্য মন্ত্রণালয়ের, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের স্টল। মেলায় আগত শিশু-কিশোরদের নবারুণ-এর পক্ষ থেকে জানাই শুভেচ্ছা।

প্রতিবেদন : প্রসেনজিৎ কুমার সে

ছোট্ট বন্ধু তাসমিনার এখন নিজের ঘোড়া

তোমরা কি তাসমিনার কথা জানো? তাসমিনা হলো নওগাঁর সেই মেয়েটি, যে ঘোড়া চালাতে খুব ভালোবাসে। তার নিজের ঘোড়া ছিল না। কিন্তু সে

অন্যদের ঘোড়া চালিয়ে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিত। আর জিতে নিত প্রথম বা দ্বিতীয় পুরস্কারটি। কিন্তু পুরস্কার পেলেও সে তা রাখতে পারত না। কেন জানো? কারণ ঘোড়াটি তো অন্য লোকের। তাই পুরস্কারটি ঘোড়ার মালিককে দিতে হতো। কিন্তু তারপরও তাসমিনা ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিত। কারণ সে ঘোড়া খুব ভালোবাসে।

তাসমিনা এখন খুব খুশি। কারণ তার নিজের ঘোড়া আছে! কীভাবে জানো? প্রথম আলো পত্রিকার পক্ষ হতে তাসমিনাকে ঘোড়া কিনে দেওয়া হয়। ৩ মার্চ ২০১৭ তে ২ লাখ টাকা দামের ঘোড়াটি তাসমিনার কাছে দেওয়া হয়। এখন সে তার নিজের ঘোড়া নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে। তাসমিনার ঘোড়দৌড় নিয়ে প্রথম আলো একটি প্রামাণ্যচিত্র বানিয়েছে। মানে ২০-২৫ মিনিটের একটি ছবি। এ ছবিটি ফেসবুকে এ পর্যন্ত ৬৩ হাজার মানুষ ১৩ লাখেরও বেশি বার দেখেছে।

ভিখারি থেকে বিক্রী তালিকায় সেরা ফরাসি লেখক!

জন মেরি রুগল, কে জানো? তিনি একজন বিখ্যাত ফরাসি লেখক। কিন্তু তাঁর জীবনের প্রথম দিনগুলো খুব কষ্টে কেটেছে। জন্মের পর তার মা-বাবা তাকে ছেড়ে চলে গেলে তিনি বড়ো হন পালক মা-বাবার কাছে। পালক মা-বাবা তাকে বেশি ভালোবাসত না। তাই রুগল রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে দিন কাটাতেন। এমনি এক সময় তার সাথে দেখা হয় প্যারিসের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জিন লুই ডেব্রির সাথে। মন্ত্রী তাকে দেখে লেখালেখি করার জন্য আহ্বান জানান। সেই থেকে তাঁর লেখা শুরু। এতে তাঁর জীবন পালটে যায়। মন্ত্রীর কথায় তিনি লেখেন তাঁর কঠিন জীবনের কথা। রুগল এখন আমাজানের ফরাসি 'বেস্টসেলার' মানে বিক্রি তালিকায় সেরা ৩ নম্বর লেখক। রুগল এখন অনেক কষ্ট করা মানুষের জন্য জ্বলন্ত উদাহরণ। যারা নিজের প্রতি বিশ্বাসী ও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী, তারা পারে তাদের নিজের জীবন পালটাতে।

আমরা ফেসবুক শুনি

'আমরা ফেসবুক শুনি' কথাটি শুনে অন্যরকম লাগছে তাই না? কারণ আমরা তো ফেসবুক দেখি। তাহলে শুনি-মানে কি? আসলে আমাদের দেশে যেসব ছেলে-মেয়েরা আছে চোখে দেখতে পায় না, তাদের

বলা হয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। আর দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য বানানো হয়েছে এমন একটি সফ্‌টওয়্যার যেখানে তারা ফেসবুক দেখতে না শুনতে পারে। মানে তারা ফেসবুকের কোনো ছবি টাচ করলে তা কথা বলে। তারা ফেসবুক খুলে মোবাইল কানের কাছে ধরে রাখে। তখন ফেসবুকে থাকা বিভিন্ন ছবির বর্ণনা শুনে থাকে। আবার তারা মন্তব্যও করতে পারে। ২৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকার শ্যামলীতে ভিপ্‌স কার্যালয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলা হয়। ভিপ্‌স হলো একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এখানকার সদস্য সংখ্যা ২৬৪ জন। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরাও আজ ফেসবুক, গুগল ম্যাপ ব্যবহার করতে পারছে। তারাও জানে যে, ফেসবুকে কিছু দেওয়ার আগে ১০ বার ভাবতে হবে।

পান্ডা সাদা-কালো হয় কেন

তোমরা সবাই নিশ্চয়ই পান্ডা চেনো এবং পছন্দ কর। পান্ডা খুব সুন্দর একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী। সারা শরীর জুড়ে রোমশ-সাদা-কালো নকশা। অন্য কোনো রং নয় শুধুই সাদা-কালো রং। তাহলে অন্য রং নয় কেন? এ প্রশ্ন অনেকের মনেই আছে। তাই একদল মার্কিন গবেষক এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন। উত্তরটি খুব মজার। পান্ডার রং সাদা-কালো হওয়ার কারণ নাকি ছদ্মবেশ ধারণ করা এবং যোগাযোগ রক্ষা করা। পান্ডার মুখমণ্ডল, ঘাড়, পেট ও পিঠের সাদা অংশগুলোর মাধ্যমে তারা তুষারের মধ্যে গা ঢাকা দিতে পারে। আর কালো রঙের হাত-পায়ের মাধ্যমে এই প্রাণীটি ছায়াযুক্ত স্থানে লুকিয়ে থাকতে পারে। পান্ডারা লতাপাতা ও বাঁশ বেশি খায়। মাংসও তারা খেতে পারে। গবেষকরা এখনো পান্ডার গায়ের রং সাদা-কালো হওয়ার আরো কারণ খুঁজে চলেছেন।

প্রতিবেদন : সাদিয়া ইফফাত আঁখি।

নাজিফা তাবাসসুম (কথা), দ্বিতীয় শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

নবনিল আহমেদ, দ্বিতীয় শ্রেণি, রূপনগর মডেল স্কুল ও কলেজ, ঢাকা

ওয়াসিফা ওসমান, চতুর্থ শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা।

ইয়ামীম সাদমান, তৃতীয় শ্রেণি, গ্রীনলন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

আহমেদ উল্লাহ, সপ্তম শ্রেণি, দনিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, দনিয়া, ঢাকা

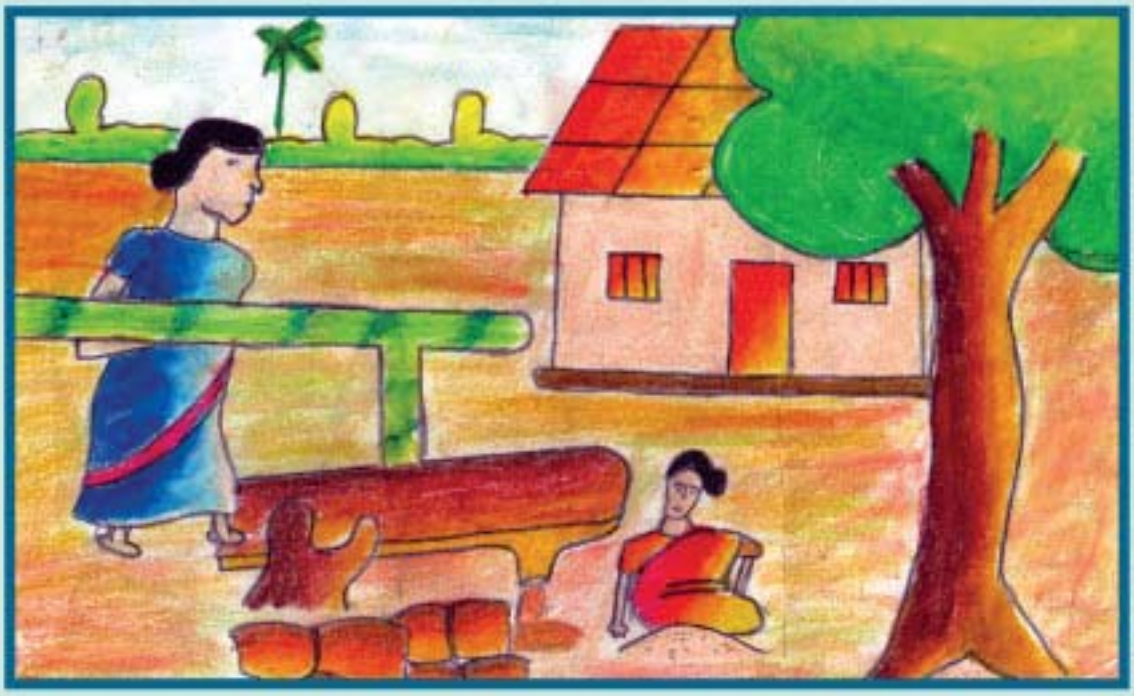

হাসিবুল হাসান, সপ্তম শ্রেণি, সেন্ট গ্রেগরীজ হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা